পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্রউপন্যাসে প্রবাদ-প্রবচন, ও বাগধারা : প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ

পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্রউপন্যাসে প্রবাদ-প্রবচন, ও বাগধারা : প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমীছায়া ত্যাগ করে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে এক নতুনত্ব এবং অভিনবত্ব আনয়ন করেন, যা অতি-আধুনিক বলে আখ্যা দেওয়া অসংগত নয়। তবে তাঁর প্রথম জীবনের উপন্যাস গুলিতে বঙ্কিমী প্রভাব থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি ঠিক কথা। কিন্তু ছোটোগল্প রচনার মতো তাঁর জীবনে সময়ের সূচি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে পালা বদল হয়েছিল, তেমনটি ঘটেছিল তাঁর শেষ পর্বের উপন্যাস লেখনিতে। 'করুণা' থেকে 'রাজর্ষি' পর্যন্ত যে ঢঙে তিনি উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনা করেছেন, তার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ভাব-ভাষা লক্ষণীয় তাঁর বঙ্গদর্শনে (নবপর্যায়) এ প্রকাশিত 'চোখের বালি' উপন্যাসের সময়কাল থেকে। জীবনের অনেকটা সময় অতিক্রম করে আসার পর তিনি 'বৌঠাকুরাণী হাট' উপন্যাসের ভূমিকায় দাবি করেছেন, — ''অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে ..... মন যে প্রবেশ করলে এ বোধ হয় কৌতূহল থেকে।''[১] এই রোমান্সের কল্পনালোকে তিনি বেশিদিন অবতরণ করেননি। বরং তিনি কল্পলোক থেকে নেমে এসে প্রবেশ করেছেন মানব মনের কারখানা ঘরে। যেখানে তিনি টেনে বার করেছেন বউমাদের প্রতি মায়ের ঈর্ষার মতো ঘরোয়া পরিসরকে। তাই তিনি যেন কলকাতা শহর ও শহরতলী কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত জীবনের এক বাস্তব চলমান ছবি পাঠক সমক্ষে তুলে ধরেছেন কাহিনির মধ্যে।

চরিত্র গুলির চাল-চলন, ভাব-ভাষা সম্পূর্ণ বঙ্কিমী রোমান্সের বিপরীত। ঘটনার স্রোতে কল্পনা ও বাস্তবতার এক পরিপূর্ণ মিলন সেতু তৈরি করে তিনি

কাহিনির গতি জীবন্ত করেছেন। চরিত্রের ভাব ও ভাষা ব্যবহারে তিনি বঙ্কিমী বা তাঁর অতীত যুগে দাঁড়ান নি। কালের ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাহিনির স্বাদে নতুনত্ব দেখা দিয়েছিল বিশ শতকের সূচনাতে। 'চোখের বালি' উপন্যাসে তিনি কাহিনির গতি সম্বন্ধে বলেছেন, — ''সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতি দেখা দিল চোখের বালিতে।''[২] তিনি নেমে পড়েছেন মনের সংসারের সেই নিত্যনতুন উৎপাদিত জটিল মানসিকতার কারখানা ঘরে, যেখানে আগুনের জ্বলনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। এরকম মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়ার বিবরণ তাঁর পূর্বের গল্প অবলম্বনে বাংলা ভাষায় প্রকাশ পায়নি।

'নষ্টনীড়' নামক ছোটোগল্প রচনার পর যেমন তাঁর ছোটোগল্পে কাহিনির মোড় ফিরেছিল, তৈরি হয়েছিল নতুন স্বাদের গল্প। ঠিক তেমনি 'চোখের বালি' রচনার পর তিনি কাহিনির গতি ঠেলে দিয়েছিলেন একেবারে মানব মনস্তত্ত্বের কাঠগোড়ায়। তিনি চরিত্রের মন নিয়ে লুকোচুরি খেলেছেন, আর কাহিনির বুনন পথকে করেছেন দূর্গম। এভাবে সৃষ্টি করেছেন জটিল মন-মানসিকতার চরিত্র। তবে একথা স্বীকার করতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের হাতের কালিতে প্রথম অঙ্কিত হয় চরিত্রের মধ্যে জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপরেখার চিত্র। অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যন্ত্রণা প্রকাশ করা এবং কাহিনির গতিকে সুচারুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি চরিত্রের মুখে ছোটো ছোটো বাক্যে লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রাণ, যা জনসমাজের মুখে প্রতিমুহূর্তে ব্যবহৃত, প্রবাদ-প্রবচন, প্রবাদমূলক বাক্যাংশ, বাগধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দের প্রয়োগ করেছেন। তাঁর কথাসাহিত্যে, এ গুলির ব্যবহারে শৈলীগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তিনি লোকসমাজে প্রচলিত প্রবাদ, বাগধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুলি কোথাও কোথাও সরাসরি প্রয়োগ করেন, আবার কোথাও স্থান-কাল-পাত্র ও কাহিনির গতিপথ

পরিবর্তনের সঙ্গে উপন্যাসে তিনি নতুন মাত্রা দান করেছেন। কিভাবে তিনি এগুলো চরিত্রের মুখে বসিয়ে ঘটনার স্রোতকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, এবং কতটা বা কী পরিমানে ও কোনও প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে তা আমরা এই অধ্যায়ে অনুসন্ধান করে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস গুলিতে যে প্রবাদ, বাগধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন, তা রবীন্দ্ররচনাবলীর অষ্টম ও নবম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত উপন্যাসে ব্যবহৃত। উক্ত বিষয়ে একটি তালিকা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

১। অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর/

২। অসারে খলুসংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরাম্ (বউঠাকুরাণীর হাট)

৩। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা (নৌকাডুবি)

৪। অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া (নৌকাডুবি)

৫। অগ্নিশর্মা (চারঅধ্যায়)

৬। অমাবশ্যার চাঁদ (ঘরে-বাইরে)

৭। আকাশ থেকে পড়া (প্রজাপতি নির্বন্ধ, চতুরঙ্গ, শেষের কবিতা)

৮। আকাশ-কুসুম (নৌকাডুবি, চার অধ্যায়, ঘরে-বাইরে)

৯। আগুনে আগুন নেভে না (চতুরঙ্গ)

১০। উড়ন চণ্ডে / চণ্ডী (শেষের কবিতা, ঘরে-বাইরে)

১১। একাই একশো (বউঠাকুরাণীর হাট)

১২। একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি (প্রজাপতির নির্বন্ধ)

১৩। কথায় কথায় (নৌকাডুবি)

১৪। কন্ঠকে নৈব কন্ঠকম (নৌকাডুবি, যোগাযোগ)

১৫। কড়ায় গণ্ডায় (শেষের কবিতা, ঘরে-বাইরে)

১৬। কপাল ভাঙলে জোড়া লাগে না (ঘরে-বাইরে)

১৭। কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনও নয় (বউঠাকুরাণীর হাট)

১৮। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ (যোগাযোগ)

১৯। খিচুড়ি পাকানো (ঘরে-বাইরে)

২০। ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায় (নৌকাডুবি)

২১। চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা (শেষের কবিতা)

২২। জহুরীই জহরৎ চেনে (শেষের কবিতা)

২৩। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ (চার অধ্যায়)

২৪। ঠাকুর ঘরে কে, আমি কলা খায়নি (চোখের বালি)

২৫। দর্পহারী মধুসূদন (নৌকাডুবি)

২৬। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো (বউঠাকুরাণীর হাট)

২৭। দুনৌকায় পা (ঘরে-বাইরে, গোরা)

২৮। ধনুক ভাঙা পণ (শেষের কবিতা)

২৯। নরাণাং মাতুক্রমঃ (বউঠাকুরাণীর হাট)

৩০। ন যযৌ ন তস্থৌ (প্রজাপতি নির্বন্ধ)

৩১। নিজের ফাঁদে নিজে পড়া (প্রজাপতি নির্বন্ধ)

৩২। নাচতে বসা ঘোমটা (প্রজাপতির নির্বন্ধ)

৩৩। পিঁপড়ের ডানা ওঠে মরিবার তরে(বউ ঠাকুরানীর হাট)

৩৪। পাঁচ কান হওয়া (শেষের কবিতা)

৩৫। পেটে এক মুখে এক (ঘরে-বাইরে)

৩৬। ফলেন পরিচীয়তে (প্রজাপতির নির্বন্ধ)

৩৭। বজ্রাহত (বউঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি, প্রজাপতির নির্বন্ধ)

৩৮। বজ্রাঘাত (বউঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি, প্রজাপতির নির্বন্ধ, চোখের বালি, নৌকাডুবি)

৩৯। বংশে বাতি দেওয়া (রাজর্ষি)

৪০। বনগাঁয়ে শেয়াল দেওয়া (রাজর্ষি)

৪১। বলং বলং বাহু বলম (প্রজাপতির নির্বন্ধ)

৪২। বিষ দাঁত ভাঙা (চোখের বালি)

৪৩। বিনা মেঘে বজ্রপাত (চোখের বালি)

৪৪। বেদবাক্য (প্রজাপতির নির্বন্ধ, বউঠাকুরাণীর হাট)

৪৫। বেনা বনে মুক্ত ছড়ানো (চোখের বালি, প্রজাপতির নির্বন্ধ)

৪৬। বৃদ্ধস্য তরুনী ভার্যা (প্রজাপতির নির্বন্ধ)

৪৭। ভিটেই ঘুঘু চরানো (বউঠাকুরাণীর হাট)

৪৮। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ (প্রজাপতির নির্বন্ধ)

৪৯। মধুরেণু সমাপয়েৎ (প্রজাপতির নির্বন্ধ)

৫০। মগের মুল্লুক (যোগাযোগ)

৫১। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া (বউঠাকুরাণীর হাট)

৫২। মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার (প্রজাপতির নির্বন্ধ)

৫৩। মাছের তেলে মাছ ভাজা (দুইবোন)

৫৪। মা ফলেষু কদাচনে (চার অধ্যায়)

৫৫। মাথায় বজ্রাঘাত (যোগাযোগ, গোরা)

৫৬। মুখে চুন কালি মাখানো (বউঠাকুরাণীর হাট)

৫৭। মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালা (বউঠাকুরাণীর হাট)

৫৮। মুখে ফুল চন্দন পড়া (নৌকাডুবি)

৫৯। মান্ধাতার আমল (বউঠাকুরাণীর হাট, চার অধ্যায়)

৬০। যস্মিন দেশে যদাচার (প্রজাপতির নির্বন্ধ, গোরা)

৬১। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতী তাদৃশী (চোখের বালি, ঘরে-বাইরে)

৬২। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন (প্রজাপতির নির্বন্ধ)

৬৩। যুদ্ধং দেহি (প্রজাপতির নির্বন্ধ, শেষে কবিতা)

৬৪। রামরাজত্ব (বউঠাকুরাণীর হাট)

৬৫। রাজায় রাজায় বাঁধে রণ, উলুখড়ের হয় মরণ (ঘরে-বাইরে)

৬৬। ললাট-লিখন না যায় খণ্ডন (নৌকাডুবি)

৬৭। শঠে শাঠ্যং সমাচারেৎ (গোরা)

৬৮। শনির দৃষ্টি (যোগাযোগ)

৬৯। যেমন সীতা তেমন রাম (যোগাযোগ)

৭০। শুভস্য শীঘ্রং (প্রজাপতির নির্বন্ধ)

৭১। ষোলআনা (চার অধ্যায়, ঘরে-বাইরে)

৭২। সর্বমত্যযুগহির্তম (প্রজাপতির নির্বন্ধ)

৭৩। সাত রাজার ধন মানিক (যোগাযোগ)

৭৪। সাপের পাঁচ পা দেখা (বউঠাকুরাণীর হাট)

৭৫। সোনার চাঁদ (প্রজাপতির নির্বন্ধ, শেষের কবিতা)

৭৬। স্বনাম্যে পুরুষো ধন্যঃ (প্রজাপতির নির্বন্ধ, ঘরে-বাইরে)

৭৭। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ (চতুরঙ্গ)

৭৮। স্ত্রী হৃদয়ের রহস্য বিধাতা বোঝে না,
(এরকম একটা প্রবাদ আছে) (প্রজাপতির নির্বন্ধ)

৭৯। স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং,
দেবান জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ (করুণা)

৮০। সাত রাজার ধন মালিক (নৌকাডুবি)

৮১। হাড় জ্বালানো (দুইবোন)

৮২। হাল ছেড়ে দেওয়া (দুইবোন)

৮৩। হাড়ে হাড়ে জ্বালানো (চার অধ্যায়)

৮৪। হাড় কালি হওয়া (যোগাযোগ)

৮৫। হাড়ে হাড়ে (যোগাযোগ)

৮৬। হালে পানি পায় না (যোগাযোগ)

৮৭। হাড় জ্বালানো (ঘরে-বাইরে)

তালিকানুসারে প্রবাদ, বাগধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দ এবং শব্দগুচ্ছগুলি উপন্যাসের মধ্যে কতখানি যথার্থ ব্যবহৃত ও বিশ্লেষিত হয়েছে, তার অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করতে গেলে, কিংবা প্রত্যেকটি প্রবাদের যুক্তিযুক্ত ব্যবহার জানতে গেলে উপন্যাসের কাহিনির প্রেক্ষাপটটি বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। সে কারণেই উপন্যাসের আলোচনার সঙ্গে সমতালেই প্রবাদগুলির প্রয়োগগত কারণ বা যুক্তি কী বা কতটা ছিল তা আমরা দেখে নেব।

'অধিকন্তু ন দোষায়' সংস্কৃত প্রবাদ বাক্যটির অর্থ প্রয়োজনের অপেক্ষা অধিক হলে কোনও দোষ বা ক্ষতি নেই। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে পতিহারা শৈলবালার চিরকুমার সভাতে নাম লেখানো এবং নিজে একেশ্বরী হয়ে থাকা প্রসঙ্গানুসারে ভগ্নিপতি অক্ষয়ের মুখে লেখক উক্ত প্রবাদটির ব্যবহার করেন। শৈলবালা একাযোগ দিয়ে যেমন কোনও লাভ নেই, তেমনি চারবোনে চিরকুমার সভা যোগদান করলেও কোনও ক্ষতি নেই। এখানে গল্পের ঘটনানুযায়ী এটির ব্যবহার যথার্থ। এই প্রবাদটি প্রয়োগ প্রসঙ্গে শৈলবালা অক্ষয়কে একা থাকার কথা জিজ্ঞাসা করলেও অক্ষয় নিজের পক্ষ নিয়ে পুনরায় আরো একটি প্রবাদাঙ্গ উল্লেখ করেন। প্রবাদাঙ্গটি হল 'সর্বমত্যন্তগর্হিতং' এটির অর্থ কোনও কিছুই আতিশয্য ভালো নয়। এখানে লেখক অক্ষয়ের কথনে পরপর একটি সংস্কৃত প্রবাদ ও একটি প্রবাদাঙ্গ যথার্থ প্রয়োগ করে কাহিনির গতিকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছেন।

'অসারে খলুসংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম' প্রবাদটির অর্থ, অসার সংসারের মধ্যে শ্বশুরবাড়ি শ্রেষ্ঠ স্থান। 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে হাস্যরসিক রমাই

ভাঁড়ের মুখে রাজার শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার কথা শোনা মাত্র রমাই প্রবাদটির ব্যবহার করেছেন। শ্বশুরবাড়িতে গেলে জামাই যে কত খুশিতে থাকতে পারে তা বোঝাতে লেখকের এই উক্তির প্রয়োগে যথার্থ। কারণ সেখানে বিনা পরিশ্রমে অতি সহজে জুটে যায় নানান আহারের পদ। দেবতা যেমন মন্দিরে শোভা পায়, ঠিক তেমনি শ্বশুর বাড়িতে জামাইয়ের মর্যাদা বোঝাতে লেখক বিন্দুমাত্র বেখায়াল হননি।

'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা' প্রবাদবাক্যটির অর্থ হল, পরিস্থিতি অনুযায়ী আয়োজন করা। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে হেমনলিনী রমেশের বিচ্ছেদে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। তার মনের অবস্থার উন্নতি করা এবং অন্য পাত্রের সঙ্গে বিবাহে রাজি করার জন্য তাকে নলিনাক্ষ ডাক্তারের বক্তৃতা সভায় নিয়ে যায়, যাতে রমেশকে ছেড়ে বক্তার প্রতি হেমনলিনীর আসক্তি বাড়ে বা একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠতে পারে, সেই প্রসঙ্গে উক্ত প্রবাদের ব্যবহার হয়। গল্পে লেখক হেমনলিনীর পরিবারের সকলের মানসিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে প্রবাদটির যথোপযুক্ত প্রয়োগ হয়েছে। এটি একটি পরিস্থিতি জ্ঞাপক প্রবাদ বাক্য।

'অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া/মারা' প্রবাদবাক্যটির অর্থ, ফলাফল না জেনে আন্দাজে কিছু বলে দেওয়া। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে নবীনকালী বাড়ির চাকর বাকরদের প্রতি সন্দেহ বশত উক্ত প্রবাদটি লেখক ব্যবহার করেন। কারণ চুরির কোনও প্রমাণ তার হাতে নেই, তবুও আন্দাজে প্রসঙ্গটি তুলে নিজের সতর্কতা প্রমান করতে চাই, যাতে ভৃত্যরা বুঝতে পারে তাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ সাধ্য নয়। নিজেকে দশ চোখ, দশ হাত অবতার অর্থাৎ চতুরদিকে তার নজর বোঝাতে প্রবাদের প্রয়োগ যথার্থ ও সার্থক হয়েছে। এটি একটি পরিস্থিতি জ্ঞাপক প্রবাদবাক্য।

'অগ্নিশর্মা' বিশিষ্টার্থক শব্দটির অর্থ, ক্রোধে ক্ষিপ্ত হওয়া। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে চা দোকানদার কানাই-এর কাছে এক দুঃস্থ ছেলে দিনাজপুরে যাওয়ার

জন্য পঁচিশটা টাকা ধার চাইলে সে দিতে রাজি হয়নি। এমন সময় ইন্দ্রনাথ বাবুর আদর্শে চলা কিছু ছেলে এই ঘটনা শোনা ও দেখার পর কানাইয়ের উপর চরম ভাবে রাগান্বিত হয়ে ওঠে। তার টাকা পয়সা থাকা সত্ত্বেও সে কাউকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না। এই আচরণের প্রতি ক্ষিপ্ততা বোঝাতে লেখক শব্দটি যথার্থ প্রয়োগ করেছেন।

'অমাবস্যার চাঁদ' বাগধারাটির অর্থ, যা সচারাচর দেখা যায় না। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের আত্মকথা পরিচ্ছেদে গল্পকার চরম বাস্তববাদী ও সত্যবাদী সন্দীপের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে বোঝাতে মাষ্টার মশায়ের কথন ভাষ্যে না-বাচক ভাবার্থে বাগধারাটি লেখক ব্যবহার করেছেন। ব্যবহারিক রূপটি হল ---- ''জানো নিখিল, সন্দীপ অধার্মিক নয়, ও বিধার্মিক। ও অমাবস্যার চাঁদ, চাঁদই বটে, কিন্তু ঘটনাক্রমে পূর্ণিমার উল্টো দিকে গিয়ে পড়েছে।''[৩]

'আকাশ থেকে পড়া' বাগধারাটির অর্থ অপ্রত্যাশিত ঘটনা। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে কুলীন ঘরের সন্তান হয়েও মৃত্যুঞ্জয় ও দারুকেশ্বরকে অক্ষয় ব্যাপ্‌টিজম ক্রিশ্চানে ধর্মান্তরিত করে, সেই মতে তার শালীকাদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা। এই ঘটনা প্রসঙ্গে উক্ত শব্দগুচ্ছের ব্যবহার, কারণ তারা জানত না পাত্রী-পক্ষ ক্রিশ্চান। তাই অক্ষয়ের কথা শোনার পর তারা হতবাক হয়ে পড়েন। ঘটনা বর্ণনানুসারে বাগধারাটির প্রয়োগ সার্থক হয়েছে এখানে। একই অর্থে লেখক 'যোগাযোগ' উপন্যাসে উক্ত বাগধারাটির ব্যবহার করেছেন।

'আকাশকুসুম' বাগধারাটির অর্থ হল কাল্পনিক বা অসম্ভব ঘটনা। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে শৈলজা-বিপিনের দাম্পত্য জীবনের যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের গল্প প্রসঙ্গে কমলার প্রতি উদ্দেশ্য করে লেখক উক্ত শব্দগুচ্ছের ব্যবহার করেন। শৈলজা-বিপিনের গল্প কমলার কাছে অপরিচিত নয়, কারণ সেও রমেশের সাথে থাকতে থাকতে শৈলজার মতো তারও একই দশা হয়েছে। তাই এই ঘটনা তার কাছে অসম্ভব বা কাল্পনিক কিছুই নয়।

বাগধারাটি লেখক-পাঠক সম্মন্ধ নির্ভর না-বাচক অর্থে এখানে প্রয়োগে যথার্থ রূপে সার্থক করেছেন। তবে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে বাগধারাটির অর্থানুসারে উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে গল্প লেখক সন্দীপের আত্মকথা পরিচ্ছেদে সন্দীপের বাস্তবতাবোধ কতটা গভীর তা বোঝাতে বাগধারাটি উল্লেখ করেছেন। গল্প কাহিনি অনুসারে সন্দীপ কল্পনা প্রবণ নয়, কিন্তু সে সবকিছু হাতের মুঠোয় পেয়ে সুখ অনুভব করতে চায়। সন্দীপ কঠোর বাস্তববাদী কল্পনার জগতে তার কোনও ঠাঁই না রেখে, সে সব কিছুই নিজের কাছে আনতে চাই। সে কল্পনার জগতে ভাসতে পছন্দ করে না। সন্দীপের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভাবধারাটির কোনও তাৎপর্য নেই। তবে গল্পের ভাব সৃষ্টিতে এটির ব্যবহার সার্থক।

'আগুনে আগুন নেভে না' প্রবাদবাক্যটির অর্থ যে বস্তুর দ্বারা ক্ষতি হয়, সেই বস্তু দিয়ে প্রতিকার করা সম্ভব নয়। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে গুরুজীর রসতত্ত্বের শিক্ষণ বা জ্ঞান দানের কথা প্রসঙ্গে দামিনীর কথন ভাষ্যে লেখক সুকৌশলে উক্ত প্রবাদটি ব্যবহার করেন। ব্যবহারিক রূপটি হল এরকম, — ''আমি তোমার গুরুর কাছ হইতে কিছুই পাই নাই। তিনি আমার উতলা মনকে এক মুহূর্তে শান্ত করিতে পারেন নাই। আগুন দিয়া আগুন নেভানো যায় না।''[৪] মানুষ যে রসের প্রতি আসক্তিহীন, সেই বস্তু দিয়ে মানুষকে আধ্যাত্মিক চিন্তার জগতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই গুরুজী যতই রসের কচ কচানি করুক না কেন, তা দিয়ে দামিনীর মনের ক্ষুধা কমানো কখনো সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক জগতের রস নয়, দামিনীর কামরসের প্রতি কতটা আসক্তি তা বোঝাতে লেখক এই প্রবাদটি নির্বাচন করেছেন। গল্পের ঘটনানুসারে যার ব্যবহার সার্থক হয়েছে।

'উড়নচণ্ডে' বিশিষ্টার্থক শব্দটির অর্থ হল অপব্যায়ী। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে গল্পকথক স্টাইলের প্রতি অমিতের বেহিসেবী চালচলন বোঝাতে

শব্দটি নির্বাচন করে প্রয়োগ করেন। গল্পের বর্ণনায় শব্দটি অমিত চরিত্র যথার্থ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আবার 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে বিমলার আত্মকথা পরিচ্ছেদে বিমলার দিদিশ্বাশুড়ির মুখে লেখক পুরুষের স্বভাব চরিত্রের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে উক্ত শব্দটি 'উড়নচণ্ডী' আখ্যায় যথার্থ ব্যবহার করেছেন। লেখক দুই উপন্যাসে শব্দটির ব্যবহার সার্থক করেছেন।

'একাই একশো' বাগধারাটির অর্থ হল একজনই যে একশো জনের ক্ষমতা ধরা। 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের রায়ের ব্যবহারে যশোরের রায় বংশ অপমানিত। সেই রোষে রাজা প্রতাপাদিত্য অপমানকারীকে রাজঅন্তঃপুরে বন্দি করেন। রাজা ব্যতীত সকলেই তাঁকে মুক্ত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় এই সংবাদ রামমোহনের কাছে পৌঁছালে, সে নিজের ক্ষমতা বহিঃপ্রকাশ করে বলে, — ''যুবরাজ আমাদের মহারাজকে একবার আমার কাছে আনিয়া দিন। আমি একা এই লাঠি লইয়া একশো জন লোক ভাগাইতে পারি।''[৫] রাজঅন্তঃপুরে থাকা একশোর অধিক জনকে পরাজিত করার সাহস রামমোহনের ছিল। রামমোহনের এই উক্তিতে বাগাধারাটির অর্থ সুস্পষ্ট হয়েছে। তার কথন ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বাগধারাটির প্রয়োগ এখানে সার্থক।

'একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি' চানক্য শ্লোকে ব্যবহৃত সংস্কৃত বিশিষ্টার্থক শব্দটির অর্থ এক চাঁদে জগৎ আলো করা। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে নয় অক্ষরে লেখা একটি রুমাল নিয়ে শ্রীশবাবু ও রসিকের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রীশের প্রতি শৈলবালা তথা অবলাকান্তের কথা প্রসঙ্গে রসিকের কথন ভাষ্যে লেখক উক্ত শব্দটির যথার্থ ভাবে ব্যবহার করেন। এটি চরিত্রের ভাবসংজ্ঞাপক শব্দ হিসাবে উপন্যাসের চরিত্রে ব্যবহার সার্থক হয়েছে।

'কণ্ঠকে নৈব কণ্ঠকম' সংস্কৃত প্রবাদবাক্যটির অর্থ হল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে রমেশ সম্পর্কে যোগেন্দ্র ও বাবা অন্নদা

একেবারে অন্ধ ছিল। সে এমন ভাবে প্রতারণা করবে তা তারা স্বপ্নে ভাবেননি। প্রতারিত হয়েও হেমনলিনীর মনে রমেশ অন্যতম পুরুষ হিসাবে দৃঢ়াবদ্ধ। তাই নলিনাক্ষ ডাক্তার কে হেমনলিনীর সঙ্গে নতুন ভাবে পরিচয় করানো এবং তা ক্রমশ শুভ পরিণয়ের দিকে উভয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কতটা সম্ভব এবং হেমনলিনীর মন থেকে রমেশের মূলোচ্ছেদ করার প্রসঙ্গে লেখক অক্ষয়ের কথনভাষ্যে প্রবাদটির ব্যবহার করেন। গল্প কাহিনির অগ্রগতি অনুসারে লেখক এখানে নলিনাক্ষের আগমনের দিকটি নির্দেশ করে উক্ত প্রবাদটির প্রয়োগ করেছেন।

আবার একই অর্থে 'যোগাযোগ' উপন্যাসে বেঙ্কটস্বামীর ছকানুসারে মধুসূদনের ক্ষতি সাধনের মূল এক স্ত্রীলোক। শাস্ত্রীজি-এর সমাধানের পথ দেখানো প্রসঙ্গে প্রবাদটি নির্বাচন করেছেন। প্রবাদটির প্রয়োগিত রূপটি হল — ''বেঙ্কটস্বামী গম্ভীর ভাবে বলে দিলে, 'কণ্ঠকে নৈব কণ্ঠকম' — অর্থাৎ উদ্ধার করবে অন্য একজন স্ত্রীলোক।''[৬] যে স্ত্রীলোক দ্বারা মধুসূদনের জীবনে সমস্যা সৃষ্টি হয়, সেই নারীর হাতেই তার মুক্তি নেই, এখানে অন্য একজন মেয়েকে তার পূর্বের স্থানে বসাতে পারলেই, তার মুক্তি।

'কড়ায় গণ্ডায়' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ হল পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করা, 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে শোভনলালের বাবা ননিগোপাল মনে মনে ঠিক করেছিল যে ছেলেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে বিয়ের বাজারে অনেক পরিমানে পণ দাবী করবেন। ননি গোপালের পণের পরিমান হিসাব প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক উক্ত শব্দগুচ্ছটি ননিগোপালের স্বভাব চরিত্রে আরোপ করে ব্যবহার করেছেন। ব্যবহারিক রূপটি হল, — ''পাত্র হিসাবে শোভনলালের বাজার দর যে কত বেশি এবং আর কিছুদিন সবুর করে থাকলে সে দাম যে কত বেড়ে যাবে ননিগোপালের হিসাবি বুদ্ধিতে সেটা কড়ায়-গণ্ডায় মেলানো ছিল।''[৭]

আবার 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের আত্মকথন পরিচ্ছেদে যৌবনের

নয়টি বছর ধরে নিখিলেশ মায়া জনিত চরম কষ্ট পেয়েছে, তা সুদেমুলে আদায় করার প্রসঙ্গক্রমে লেখক শব্দগুচ্ছটি বেছে নিয়েছেন। এই শব্দগুচ্ছটি চয়নের মধ্যে দিয়ে লেখক নিখিলেশের ভিতরকার যন্ত্রনাকে টেনে এনে শব্দগুচ্ছটির ব্যবহারে সার্থক করেন। তবে লেখক 'কড়ায় গণ্ডায়'-এর ভাব অপরিবর্তীত রেখে 'কড়ায় কড়ায়' রূপে লেখকের কুশলী প্রয়োগ দেখা যায়।

'কপাল ভাঙলে জোড়া লাগে না' প্রবাদ বাক্যটির অর্থ হল সৌভাগ্য একবার নষ্ট হলে পুনরায় তা ফিরে না পাওয়া। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে প্রবাদ হিসাবে নয়, 'কপাল ভাঙা' প্রবাদাঙ্গ হিসাবে লেখক উল্লেখ করেন। শ্বশুরবাড়ির বড়ো দুই সুন্দরী জায়ের মন্দ ভাগ্যের বিড়ম্বনা এবং তাদের চরম ক্ষতির প্রসঙ্গে উপন্যাসিক বিমলার আত্মকথনে উক্ত প্রবাদাঙ্গের প্রয়োগ করেছেন। প্রয়োগিত রূপটি এরকম — ''আমার দুই বিধবা জায়ের মতো এমন সুন্দরী দেখা যায় না। পরে পরে যখন তাঁদের দুজনেরই কপাল ভাঙল তখন আমার দিদি শাশুড়ি পণ করে বসলেন যে তাঁর একমাত্র অবশিষ্ট নাতির জন্যে তিনি আর রূপসীর খোঁজ করবেন না।''[৮] এই কষ্টে দিদি শ্বাশুড়ি চাইতেন না, তার নাতির বা নাতবউ জীবনে অশুভো ছায়া নেমে আসুক। তাই ব্যবহারিক প্রসঙ্গানুসারে প্রবাদাঙ্গের প্রয়োগটি সার্থক হয়েছে এখানে।

'কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয়' প্রবাদটি সকলেরই জানা ও মুখে মুখে প্রচলিত। 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে নবম পরিচ্ছেদে চন্দ্রদ্বীপের রামমোহনের সঙ্গে বিভার মাতা-পুত্রের সম্পর্কের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। বৃদ্ধ রামমোহন দীর্ঘদিন পর মা বিভার কাছে এলে, বিভা আহ্লাদিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, সে এতদিন আসেনি কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহনের মুখে লেখক উল্লেখিত প্রবাদটির প্রতিষ্ঠা করেছেন। রামমোহন মনে মনে ভাবতে থাকে যে ছেলেরা খারাপ হয়, তাই তারা মাকে ভুলে যেতে পারে। কিন্তু

গর্ভধারিনী মাতার ক্ষেত্রে এটা সম্ভব নয়। তবুও কেন মা তাকে দীর্ঘদিন খোঁজ করেনি। এই মনোভাবকে প্রতিষ্ঠা দিতে গল্পে প্রবাদটির প্রয়োগ যথার্থ।

'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ — কুরু যুদ্ধের মতো কোনও তুমুল ব্যাপার। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে বিয়ের পর কুমুদিনীর সঙ্গে মধুসূদনের মনোমালিন্য হওয়ায় কুমু বাপের বাড়িতে চলে যায়। সেখানে দীর্ঘদিন থাকা সত্ত্বে মধুসূদন তাকে বাড়িতে আসার জন্য যেমন আদেশ পাঠাননি, ঠিক তেমনি নিজে গিয়েও আনারও আগ্রহ দেখাননি। এমনকি কুমুর অসুস্থ দাদা কলকাতায় এলেও মধুসূদন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত করেন নি। এই ঘটনায় কুমুর দাদা ভগ্নিপতি মধুসূদনের প্রতি মনে মনে ক্রোধান্বিত হয়। দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে উভয় পরিবারের মধ্যে তীব্র মান-অভিমানের পালা। হঠাৎ একদিন মধুসূদন নিজে কুমুকে আনতে যাবেন, এই যাওয়া সংবাদ প্রসঙ্গে গল্পকার মতির মার কথনভাষ্যে শব্দগুচ্ছটি ব্যবহার করেন। তবে বিপ্রদাস ও মধুসূদনের বর্তমান সময় যে খারাপ বা পরস্পরের প্রতি রাগ এবং কাহিনির গতি ক্রমশ জটিল হয়েছে। পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে লেখক সঠিক শব্দগুচ্ছটি নির্বাচন করে তা যথার্থ ব্যবহার করেন।

'খিচুড়ি পাকানো' বাগধারাটির অর্থ সহজ বিষয়বস্তুকে জটিল করে তোলা। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের আত্মকথা পরিচ্ছেদে গল্প কথক দেশের সিংহাসনে বসে থাকা রাজনৈতিক ক্ষমতাধারীদের মিথ্যাকে সত্য, আর সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে বলা সাধারণ বিষয়গুলো জনসমক্ষে জট পাকিয়ে তোলেন। এই সরল থেকে জটিলতর করার কথা প্রসঙ্গে লেখক নিখিলেশের ভাবনায় উক্ত বাগধারাটি সার্থক ভাবে প্রয়োগ করেছেন। এই বানানো কাহিনি সাধারণ মানুষকে তারা খিচুড়ির মতো গেলাতে থাকেন। উদৃষ্ট ব্যক্তিদের সার্থ কায়েম হলেও, সাধারণের ভিতরে সৃষ্টি হয় গভীর জটিলতা। সমাজের অন্তরে পাকিয়ে

ওঠা সমস্যাকে লেখক খিচুড়ি রান্নার সাথে তুলনা করতে গিয়ে বাগধারাটি সার্থক ভাবে ব্যবহার করেন। এটি পাঠক লেখক সম্মন্ধ নির্ভর বাগধারা।

'ঘর পড়া গরু সিঁদুরে মেঘে ডরায়' প্রবাদবাক্যটির অর্থ এক বিপদের পুনরাবৃত্তিতে আতঙ্কিত হওয়া। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে হেমনলিনীর হৃদয়ে ভালোবাসার পুরুষ হিসাবে রমেশের নাম দৃঢ়াবদ্ধ। এ ঘটনা পরিবারের সকলে, অর্থাৎ অন্নদাবাবু ও যোগেন্দ্র জানলেও কেউ তার ভবিষ্যৎ ভাবনা ভেবে বাঁধা দেয়নি। তাই এখন বাবা-ছেলে হেমনলিনীকে অন্য কাউকে বিয়ে করার কথা বলতে মনে মনে বেশ আতঙ্কিত। কারণ হেম যে রমেশের দ্বারা অপমানিত ও প্রতারিত এই পরিস্থিতি বোঝাতে অক্ষয় বাপ ছেলেকে দোষারূপ উদ্দেশ্য করে উক্ত প্রবাদটির ভাবার্থ প্রয়োগ করেন। এটি একটি চরিত্র-পাঠক সম্মন্ধ নির্ভর প্রবাদ, যা পাঠককে শুদ্ধ ভাবনার জগতে নিয়ে যায়।

'চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ, কোনও কিছু নির্দিষ্ট করে দেখানো। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কাহিনি বুননের সঙ্গে সঙ্গে মতানৈক্যের প্রসঙ্গে যথার্থ ভাবে শব্দগুচ্ছটি পূর্ণবাবুর কথনভাষ্যে ব্যবহার করেছেন। যদিও লেখক শব্দগুচ্ছটি না-বাচকার্থে প্রয়োগ করেন। এটি একটি চরিত্র পাঠক সম্মন্ধ নির্ভর শব্দগুচ্ছ।

'চুরি বিদ্যা বড়ো বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা' বিখ্যাত প্রবাদটি 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে লেখক কোনও কিছু দেখতে পেয়েও না পাওয়ার ভাবকে বোঝাতে প্রবাদটি উল্লেখ করেন। প্রবাদটির ব্যবহারিক রূপটি হল, — ''অমিত তাকে দূর থেকেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে এবং নিজেকে ভুলিয়েছে যে, ধূমকেতু বুঝি সেটা বুঝতে পারেনি। কিন্তু দেখেও দেখতে না পাওয়াটা একটা বড়ো বিদ্যোর অর্ন্তগত, চুরি বিদ্যের মতোই। তার সার্থকতার প্রমাণ হয়, যদি না পড়ে ধরা।''[৯] লেখক তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে উক্ত প্রবাদটি নির্বাচন করে অমিতের কথন ভাষ্যে যথার্থ ভাবে এটির প্রয়োগে সার্থক করেছেন। গল্পের

কন্টেক্স অনুসারে না বলে কিছু নেওয়া যেমন চুরি, ঠিক তেমনি দেখেও এড়িয়ে যাওয়া চুরির কিছুই কম নয়।

'জহুরীই জহরৎ চেনে' প্রবাদবাক্যটির অর্থ যে বিষয়ে যার অভিজ্ঞতা, সেই বিষয়ে সে ভালোমন্দ সহজেই বোঝে। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে সাত নং পরিচ্ছেদে লাবণ্যের প্রতি স্টাইলিষ্ট অমিতের গভীর ভালোবাসা, অমিত লাবণ্যকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেওয়া, তাতে রাজি হওয়া, এবং সে অতি সহজে পাত্রী লাবণ্যকে পাওয়া, তার মূল্যবোঝা প্রসঙ্গে গল্পকার মাসিমার মুখে প্রবাদটির ভাবানুসঙ্গ ব্যবহার করে মূল প্রবাদটি বোঝাতে চেয়েছেন। ভাবনুবাদের প্রয়োগিত রূপটি হল, — "যে রত্নকে সস্তায় পাওয়া গেল তারও আসল মূল্য যে বোঝে সেই জানব জহুরি।"[১০] লাবণ্য যে মূল্যবান, তার প্রতি দায়িত্বভার বহন করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাকে নিয়ে চলতে গেলে অমিতের মতো পাকাপক্ত ও অভিজ্ঞ জহুরীর প্রয়োজন। আসলে অমিত প্রকৃত জহুরী কিনা, তার প্রণাম লাবণ্যকে নিয়ে সংসার করারক্ষেত্রে বোলা যাবে, লাবণ্যকে নিজের কাছে কতটা ধরে রাখতে পেরেছে। আর এই ধরে রাখাটাই জহুরীর বড় পরিচয়।

'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' প্রবাদবাক্যটির অর্থ হল সর্বকাজে বিশেষজ্ঞ যিনি অর্থাৎ সব কাজ যার দ্বারা সুসম্পন্ন হয়। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে অতীনের আর্থিকাবস্থাকে সচল করে রাখা, বা তার কোনও সমস্যা না হওয়ার জন্য এলা তার ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে জমানো টাকা অতীনের দরকারে দিতে চাই। এলা টাকা দিয়ে অতীনের দরকার মেটানো প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবাদবাক্যটি প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যবহার না করে পরোক্ষ ভাবনায় প্রয়োগ করেছেন। তার প্রয়োগিত রূপটি হল — "খুবই দরকার পড়লে ম্যাটরিকুলেশনের নোটবই লেখা থেকে আরম্ভ করে কুলিগিরি পর্যন্ত খোলা রয়েছে।"[১১] অতীন সর্বকর্মেই পারদর্শী তা প্রকাশ্যে আনতে গল্পকার উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করেন। তাই

সে এলার দেওয়ার টাকা সহজে নিতে চাইনি। লেখক এখানে প্রবাদের ভাবানুষঙ্গটি তুলে ধরেন গল্পকথনে।

'ঠাকুর ঘরে কে? না, আমি তো কলা খাইনি' প্রবাদ বাক্যটির অর্থ হল অভিযোগের পূর্বেই অপরাধ অস্বীকার করলেও অজ্ঞাতসারে তা স্বীকৃতি পায়. 'চোখের বালি' উপন্যাসে আশালতা প্রতি বিহারীর দুর্বলতা প্রকাশ প্রসঙ্গে বিহারীর প্রতি মহেন্দ্রের বিষোদ্‌গার যুক্ত কথনে উক্ত প্রবাদের প্রয়োগ দেখা যায়। এটির প্রয়োগরূপটি হল এই রকম, — ''সে একটু হাসিয়া কহিল, 'ঠাকুর ঘরে কলা খাইবার যে গল্প আছে, তোমার ঠিক তাই দেখিতেছি। তোমাকে দোষ স্বীকার করিতেও বলি নাই, অস্বীকার করিতেও বলি নাই, তবে ক্ষমা চাহিয়া সাধু হইতে আসিয়াছ কেন।''[১২] সব জানা সত্ত্বেও বিহারী না জানার ভান করাটা মহেন্দ্রের সহ্য হয়নি। তাই আশার কথা বিহারী বলতে প্রবাদ বাক্যটির সরাসরি নয়, ভাবানুবাদের ব্যবহার লক্ষণীয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রবাদটির ব্যবহার যথার্থ ও সার্থক হয়েছে। এখানে লেখক প্রবাদটি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করেননি। ভাবের অনুষঙ্গেই তিনি কাহিনির পরিপূর্ণতার সাথে প্রবাদের পূর্ণতা প্রকাশ করেছেন।

'দর্পহারী মধূসূদন' বাগধারাটির অর্থ যিনি অতি গর্বিত ব্যক্তির গর্বকে চুর্ণ করে। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে রমেশের প্রচণ্ড জোরে ক্ষুধা পেলেও খাবারের আয়োজন না থাকায় সে কমলাকে কিছুই বলেনি। কিন্তু আয়োজনহীন অবস্থায় কমলা রমেশকে জোর করে খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে উক্ত বাগধারাটির ব্যবহার হয়েছে। এটির ব্যবহারিক রূপটি হল এইরূপ — ''এখন তো খুব চাবি ঠকঠক করিয়া ডাকিয়া আনিলে, শেষকালে পরিবেশনের সময় যেন দর্পহারী মধুসূদন দেখা না দেন।''[১৩] অর্থাৎ আয়োজনহীন অবস্থায় গর্ব করে ডেকে এনে খাবার না দিতে পারার গর্ব সকলের সম্মুখে বেরিয়ে না পড়ে। কারণ কমলার হাঁড়ি সে সময় উনানে চড়েনি যা রমেশের অজ্ঞাত নয়। ক্ষুধা

নিবৃত্তি করার মতো সামর্থ তার ছিল না তবুও রমেশের খাওয়ানোর ইচ্ছা প্রবল। কথকের বর্ণনানুসারে বাগধারাটির প্রয়োগ যথার্থ হয়েছে। এটি একটি চরিত্র নির্ভর বাগধারা।

'দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো' প্রবাদ বাক্যটির অর্থ হল 'উৎকৃষ্ট বস্তুর অভাব নিকৃষ্ট বস্তুর দ্বারা পূর্ণ করা। 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসে লেখক প্রবাদটি এই ভাবে উল্লেখ করেন, — ''উদয়াদিত্যকে দেখিয়া বসন্ত রায় হাসিয়া কহিলেন, ''দেখো ভাই, বিভা আমাকে ছাড়িতে চায় না। কী জানি আমাকে উহার কীসের আবশ্যক! এককালে যে দুধ ছিল, বুড়া হইয়া যে ঘোল হইয়া উঠিয়াছে, তা বিভা দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে চায় কেন? আমি যাব শুনিয়া বিভা কাঁদে!''[১৪] অর্থাৎ যৌবন যে বৃদ্ধতে পরিণতি পেয়েছে, তবুও উভয়ের ভালোবাসার বাঁধন ছিন্ন হয়নি। আসলে রাজপুত্র উদয়াদিত্য এবং বিভা দাদামশাই অর্থাৎ বসন্ত রায়ের একান্ত স্নেহের আদরে বড়ো হয়েছে। বলা যায় যেন একে অপরের প্রাণ। রাজা প্রতাপাদিত্যের হাতে দাদামশাই বসন্ত রায়ের চরম বিপদের কথা শোনার পর বিভা নিজেকে স্থির রাখতে পারছেনা। বসন্ত রায়ের প্রতি তার পূর্ব স্মৃতি যত জাগরিত হচ্ছে, ঠিক তত বেশি সে বসন্ত রায়কে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা। বসন্ত রায় যতই কথা বলতে থাকে, বা পাকা চুল তোলার সময় নানান গল্প করতে থাকলেও তাতে বিভার স্বাদ মেটেনা। এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায়, বিভার প্রতি লক্ষ করে লেখক বসন্তরায়ের মুখে লোক মুখে চির পরিচিত প্রবাদ বাক্যটি অপরিবর্তীত অবস্থায় ব্যবহার করেন। ঘটনা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রবাদটির প্রয়োগ যথার্থতা পেয়েছে।

'দু-নৌকায় পা' বাগধারাটির অর্থ হল একদিকের সম্পূর্ণ নির্ভর না করে, দুদিক রক্ষা করা বিপজ্জনক। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপের আত্মকথা পরিচ্ছেদে রিয়ালিটির পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথ বাস্তব ও অবাস্তবের মাঝে থাকা

মানুষ জনের দুর্দশার কথা বোঝাতে বাস্ত বাদী সন্দীপের মুখে উক্ত বাগধারাটি স্থাপন করেন। এটি একটি পরিস্থিতি জ্ঞাপক বাগধারা হিসাবে লেখক নির্বাচন করে তা প্রয়োগে কাহিনির গতিকে সার্থক করেছেন। ব্যবহারিক ভাবনাটি এরূপ — ''যারা এ-কথা বুঝতে দ্বিধা করে না, মানতে লজ্জা করে না তারাই কৃতকার্য হল, আর যে হতভাগারা একদিকে প্রকৃতি আর এক দিকে অবতারের উৎপাতে বাস্তব অবাস্তব দু-নৌকায় পা দিলে দুলে মরছে তারা না পারে এগোতে না পারে বাঁচতে।''[১৫] এভাবে চলাই তাদের দুদিকে বিপদের সম্ভবনা প্রবল।

'ধনুক-ভাঙা পণ' বাগধারাটির অর্থ হল দৃঢ় ভাবে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হওয়া। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে যোগমায়ার ইচ্ছায় অমিত-লাবণ্যের বিয়ের সম্মন্ধ পাকাপাকি ভাবে ঠিক হয়ে গেলেও মাঝখানে লাবণ্য বিয়ে করবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এই ঘটনায় যোগমায়া লাবণ্যের উপর ক্রোধান্বিত হওয়া প্রসঙ্গে লেখক যোগমায়ায় মুখের ভাষায় সুকৌশলে উক্ত বাগধারাটি গল্পের কথনধারায় স্থাপন করেন। বিয়ের প্রতি কিংবা অমিতের প্রতি লাবণ্যের হৃদয় ও মনের দৃঢ়তা বোঝাতে বাগধারাটির ব্যবহার সার্থক।

'নরাণাং মাতুলক্রমঃ' 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে ব্যবহৃত সংস্কৃত বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ হল মনুষ্যের প্রকৃতি মাতুলের অনুরূপ। রাজা প্রতাপাদিত্য নিজের ছেলে যুবরাজ উদায়দিত্যের স্বভাবচরিত্র কেমন তা বোঝাতে গিয়ে শব্দগুচ্ছের ব্যবহার করেন লেখক। আসলে উদয়াদিত্য পিতৃত্বের স্বভাব পায়নি, সে পেয়েছে মামাদের স্বভাব। তাই সিংহ শাবক হয়েও হিংস্র হয়ে উঠতে পারেনি। যা তাঁর পিতা প্রতাপাদিত্যের মনে বড়ো দুঃখ। ছেলের স্বভাব চরিত্রে। প্রতি বিরূপ মনভাব বোঝাতে লেখক প্রতাপাদিত্যের কথন কৌশলে উক্ত শব্দগুচ্ছটি সঠিক ভাবে প্রয়োগ করেছেন।

‘ন যযৌ ন তস্থৌ’ প্রবাদবাক্যটির অর্থ হল, না এদিক না ওদিক করা। ‘ প্রজাপতির নির্বন্ধ’ উপন্যাসে শ্রীশ ও বিপিনের সমক্ষে রসিক নৃপবালা ও নীরবালাকে নিয়ে নানা অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকলে, দুই বোন বিরক্ত হয়ে আগত পাত্রের সম্মুখে থেকে চলে যেতে উদ্যত হয়, তখন শ্রীশ ও বিপিন দুইবোনকে বাঁধা দেয়। কারণ তারা রসিকবাবুর অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে রাজি নয়, তারা তাদের দু-বোনের সাথে আলাপচারিতা করতে চাই। একদিকে তাদের প্রতি রসিকের কটু কথা অন্য দিকে আগতদের সম্মান, এই পরিস্থিতিতে লেখক উক্ত প্রবাদটি ব্যবহার করেন। এটি একটি পরিস্থিতিজ্ঞাপক প্রবাদ। তিনি গল্পের ছলে প্রবাদ প্রয়োগে সার্থক।

‘ননির পুতুল’ বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ হল ‘অতি আদরের বস্তু’। ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসে নক্ষত্র রায়ের নরম স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লেখক উক্ত শব্দগুচ্ছটি রঘুপতির মুখের বাককৌশলে স্থাপন করেন। রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করার অপরাধে নক্ষত্র রায়কে রঘুপতি তীব্র কটাক্ষ সরূপ শব্দগুচ্ছের ব্যবহার করেছেন।

‘নিজের ফাঁদে নিজেই পড়া’ বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ হল অপরকে বিপদে ফেলতে গিয়ে নিজে সেই বিপদে পড়া। ‘প্রজাপতির নির্বন্ধ’ উপন্যাসে রসিকের ভাবনায় শব্দগুচ্ছটি ব্যবহৃত। কারণ সে বিপিন ও শ্রীশকে রাজি করিয়ে নৃপবালা ও নীরবালার কাশী থেকে দেখতে দুজন পাত্রকে জগত্তারিনীর বাড়িতে না এনে অন্য ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন। এই ঘটনা যদি কোন কারণবশত পাত্রীদের মা জানতে পারেন, তাতে রসিকের ধারণায় শ্রীশ এবং বিপিনের বিপদ হতে পারে, অর্থাৎ অবশেষে উভয়েই নৃপবালা ও নীরবালাকে বিয়ে না করতে হয়। সেই ঘটনায় রসিক নিজের বুদ্ধির কৌশলহীনতায় ধরা না পড়েন। এই প্রসঙ্গানুসারে লেখক যথার্থ ভাবে শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ করেন।

‘নাচতে বসে ঘোমটা’ প্রবাদটির অর্থ হল কোনও কাজ করতে গিয়ে অতি সংকোচের ভান করা। ‘প্রজাপতির নির্বন্ধ’ উপন্যাসে পাত্ররা কুলীন সন্তান হয়েও মদ ও মাংস খেতে তাদের দ্বিধা সংকোচ নেই। ভগ্নিপতি অক্ষয়ের মুখে আহারের আয়োজন শোনার পর মৃত্যুঞ্জয় ও দারুকেশ্বর লোভ সামলাতে না পেরে চারিদিকে দেখে নিয়ে ইতস্তত করতে থাকে। এ প্রসঙ্গক্রমে উক্ত প্রবাদের ব্যবহার। ব্যবহারিক রূপটি হল এরকম, — ‘‘অক্ষয় কহিলেন, ‘ভয় কীসের মশায়? নাচতে বসে ঘোমটা?’ শুনিয়া দারুকেশ্বর দুই হাত দুই পা চাপড়াইয়া হাসিতে লাগিল। কহিল, ‘তা, মুগিই ভালো, কাটলেট! কী বলেন?’’[১৬] অর্থাৎ যদিও তাদের লোভ ষোলআনা, তবুও তাদের লোক দেখানো মুখ চাওয়া চাওনি করাটা উভয়ের পক্ষে গল্পে ব্যবহৃত প্রবাদের মতো। সুতরাং চরিত্রের ভাব প্রকাশক প্রয়োগ এই প্রবাদটি।

‘পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরিবার তরে’ ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত প্রবাদ বাক্য। এটির অর্থ হল ‘অত্যাধিক বার্ধক্যের আসন্ন মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ’। পিঁপড়ের পাখা ওঠে যেমন মরবার জন্য, ঠিক তেমনি পাখা গজিয়েছিল ‘বউঠাকুরানীর হাট’ উপন্যাসের রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজকর্মচারী প্রহরীদের। তারা যুবরাজকে পাহারা দেয়নি, এমনকি বসন্ত রায়ের সঙ্গে পালানোর খবর পেয়েও তাদেরকে ধরার চেষ্টা করেননি, এই সংবাদ রুক্মিনী প্রত্যক্ষদর্শী রাজ সভাভবনে তথা সকলের রাজার সম্মুখে বলায় প্রহরীদের আঁতে ঘা লাগে। এতে রুক্মিনী মনে হয়েছিল প্রহরীদের আর রাজসুখ ভোগ করা হবে না। পিঁপড়ের পাখা ওঠার মতো তাদের একই দশা হবে। অর্থাৎ তারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এ ঘটনার ক্রমানুসারে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী রুক্মিনীর মুখে প্রবাদটির ব্যবহার সার্থক।

‘পাঁচ কান হওয়া’ বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ হল কোনও কিছু গোপন না থেকে ছড়িয়ে পড়া। ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে অমিত লাবণ্যের নাম ছোটো করে বন্য থেকে বন্যা নামে ডাকায় লাবণ্যের আপত্তি নেই, যদিও

অমিত নামটি গোপন রাখতে চাই। কিন্তু লাবণ্য না চাওয়া প্রসঙ্গে লেখক অমিতের কথনভাষ্যে উক্ত শব্দগুচ্ছটি গল্পের ধারা অনুযায়ী সার্থক ভাবে প্রয়োগ করেছেন।

'পেটে এক, মুখে এক' প্রবাদবাক্যটির অর্থ হল মনের কথা মুখে ব্যক্ত না করা। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে বিমলার সহজ সরল ও সৎ স্বামীর প্রতি তার বিধবা জায়েরা পিছনে যে কটূক্তি এবং অসৎ মনোভাব প্রকাশ করে, তার প্রসঙ্গে লেখক বিমলার আত্মকথা পরিচ্ছেদে, বিমলার মুখে প্রবাদটি উল্লেখ করেন। তারা স্বামীর সম্মুখে সহনশীলতা, আর পিছন ফিরলে তার প্রতি ঘর গোড়া সমালোচনায় লেখক প্রবাদটি যথার্থ নির্বাচন করেছেন। কারণ যে স্বামী দুই বিধবা বউদির প্রতি বিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল, তবুও তাকে টিটকারী এবং বাঁকা কথা বলতে তারা ছাড়েনি। কাহিনির অগ্রগতিতে লেখক বিমলা চরিত্রের মুখে যথার্থভাবে ও সঠিক জায়গায় প্রবাদটি ব্যবহারে নির্বাচিত হয়েছে।

'ফলেন পরিচীয়তে' সংস্কৃত প্রবাদঙ্গটি অর্থ হল কোনও কিছুর গুণাগুণ তার ফলে বা পরিনামে বোঝা যায়। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে চিরকুমার সভা থেকে কুমার ব্রত তুলে দেওয়ায় শ্রীশ ও বিপিন ছাড়া সকলেই সম্মত। কিন্তু রসিক উভয়কে বুঝিয়ে রাজি করিয়েছেন। তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা এবং রসিক কৃতিত্ব জাহির করার প্রসঙ্গানুসারে লেখক উক্ত প্রবাদাঙ্গের ব্যবহার করেন। রসিক চরিত্রের গুণকে বোঝাতে প্রবাদাঙ্গের সার্থক প্রয়োগ করেছেন।

'বংশে বাতি দিতে কেউ না থাকা' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ 'নির্বংশ হওয়া বা বংশ লুপ্ত হওয়া।' 'রাজর্ষি' উপন্যাসের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে রাজার আদেশানুসারে হিন্দু সমাজে বলি প্রথা বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে কাহিনিকার উক্ত শব্দগুচ্ছটি রঘুপতি মুখে ব্যবহার করেন। গল্পে শব্দগুচ্ছের ব্যবহারিক রূপটি হল, — ''রাজাকেই বড়ো করিয়া লইয়া তোদের মাকে তোরা রাজ্য

হইতে অপমান করিয়া বিদায় করিলি। সুখে থাকিবি মনে করিস নে। আর তিন বৎসর পরে এতো বড়ো রাজ্যে তোদের ভিটেয় চিহ্ন থাকিবে না — তোদের বংশে বাতি দিবার কেহ থাকিবে না।"[১৭] জনসাধারণের মধ্যে ভয়ভীতি এবং রাজার আদেশকে অমান্য করার প্রসঙ্গ অনুসারে লেখক রঘুপতির মুখে শব্দগুচ্ছের সার্থক প্রয়োগ করেছেন।

'বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা' 'রাজর্ষি' উপন্যাসে উক্ত প্রবাদবাক্যটি রাজ পুরোহিত রঘুপতি নক্ষত্র রায়কে উদ্দেশ্য করে ব্যবহার করেন। প্রয়োগ রূপটি এই রকম, — "তুমি রাজবংশে জন্মিয়াছ, তোমার পূর্বপুরুষেরা সকলে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন। তুমি কি না আজ এই বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা হইয়া বসিয়া আছ আর বলিতেছ, 'বেশ আছি!"[১৮] নক্ষত্র রায়ের শরীরে রাজরক্ত থাকলেও সে নির্বাসনে গিয়ে, অর্থাৎ নিজের রাজঅধিকার ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে রাজা হয়ে নিজের মনবাসনা পুরণ করছে। কিন্তু রঘুপতির কাছে এই রাজার প্রকৃত রূপ হল শেয়াল রাজার মতো, নির্বাসিত হওয়ার যে দুঃখ, কষ্ট তা নক্ষত্র বহিঃপ্রকাশ না করলেও, রঘুপতি অতি সহজে বুঝতে পারেন। এ প্রসঙ্গক্রমে নক্ষত্র রায়কে তীব্র কটাক্ষ করতে গিয়ে এই প্রবাদটির লেখক প্রয়োগ করেছেন। এটি একটি পরিস্থিতি জ্ঞাপক প্রবাদ।

'বলং বলং বাহুবলম' সংস্কৃত প্রবাদবাক্যটির অর্থ হল বাহুর ক্ষমতা হল তার শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে ভোজন প্রিয় রসিকের প্রতি শৈলবালার নিয়ম চলে না, কারণ, রসিক যেচে এবং কেড়ে খেকো ব্যক্তি, তাই মিষ্টান্ন ভোজন থেকে শৈলবালা রসিককে বাদ দিতে চাইলেও রসিক নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে খাবারে ভাগ বসাবে। এই প্রসঙ্গে লেখক উক্ত প্রবাদের প্রয়োগে কাহিনিরি ধারাবাহিকতাকে ধরার চেষ্টা করেছেন।

'বিষ দাঁত ভাঙা' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ হল 'ক্ষতি করবার শক্তি নষ্ট করা।' 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিনোদিনীর আগমনে মহেন্দ্র নব দাম্পত্য

জীবনের সুখ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। সে আশালতাকে যত বার করে কাছে পেতে চাই, তা বিনোদিনীর জন্যই ততই বেশি দেরি হয়। এটা মহেন্দ্রের সহ্য হয়নি। তাই বিনোদিনীকে বাড়ি থেকে বিদায় দেওয়া প্রসঙ্গে লেখক বিহারী মুখে উক্ত শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ করেছেন। এখানে 'বিষদাঁত ভাঙা' অর্থে বিনোদিনীকে নতুন ভাবে বিবাহ দিয়ে চির তরে অন্যের বাড়িতে স্থায়ী করে দেওয়া। মহেন্দ্রের সুখের জন্য বিহারীর এই উক্তি। যাতে সে মহেন্দ্র আশার দাম্পত্য জীবনে আঁক না কাটতে পারে।

'বিনা মেঘে বজ্রপাত' বাগধারাটির অর্থ অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপদ ঘটা। 'চোখের বালি' উপন্যাসে অভিমান করে মহেন্দ্রের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া ও আশার প্রিয়হীন কণ্ঠের কথা বলা প্রসঙ্গে উক্ত বাগধারাটির ব্যবহার। ব্যবহারিক রূপটি হল, — ''তুমি নিজেই আমার কোন গুণে ভুলিলে প্রিয়তম, কী দেখিয়া আমার এত আদোর বাড়াইলে আর আজ বিনা মেঘে যদি বজ্রপাতই হইল, তবে সে বজ্র কেবল দগ্ধ করিল কেন। একেবারে দেহমন কেন ছাই করিয়া দিল না।''[১৯] মহেন্দ্রের বাড়ি ছাড়া এখানে আশার একার বিপদ ঘটেনি, বিনোদিনীরও বিপদ ঘটেছে। কারণ সে যে মহেন্দ্রকে মনে মনে পছন্দ করে। তাই আশার লেখা চিঠিতে শুধুই আশার কথা ব্যক্ত হয়নি, হয়েছে বিনোদিনীর কথাও। সেটা বুঝতে মহেন্দ্রের বিন্দুমাত্র দেরি হয়নি। চরিত্রের পরিস্থিতি অনুসারে লেখকের বাগধারাটির প্রয়োগ সার্থক। এখানে একবাক্যে দুইজনের মনের অবস্থাকে তুলে ধরেন।

'বেদবাক্য' বিশিষ্টার্থক শব্দটির অর্থ, যে কথা অভ্রান্ত সত্য বলে গৃহীত। যদিও 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে উল্লেখিত অর্থের নিরিখে শব্দটি ব্যবহার হয়নি। উদয়াদিত্যের মাঝরাতে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার কারণ রাজা প্রতাপাদিত্য মন্ত্রীর কাছে জানতে চায় এবং শ্রীপুরের জমিদারের মেয়েটি উদয়াদিত্যকে কোনও কুপরামর্শ দিচ্ছে কিনা তা জানতে চাইলে মন্ত্রী নিরুত্তর

থাকে। তাতে রাজা প্রতাপাদিত্য বলেন, — ''তোমার কাছে কি আমি বেদবাক্য শুনিতে চাহিতেছি? তুমি কি আন্দাজ কর, তাই বলো না।''[২০] অর্থাৎ রাজা বেদের ধ্রুব সত্য কথা শুনতে চাইনি। তিনি উদয়াদিত্যের এরকম ব্যবহারের কারণ সম্পর্কে মন্ত্রীর ধারণা জানতে চেয়েছে। এখানে লেখক মন্ত্রীর অপদার্থতা প্রমান হিসাবে শব্দটির উপরে বিপরীত অর্থ প্রয়োগ করেছেন।

'বেনা বনে মুক্ত ছড়ানো' প্রবাদটি অর্থ যে ব্যক্তি বিশেষ বস্তুর মূল্য বোঝে না, তার কাছে সেই বস্তুর উপস্থাপন করা ব্যর্থ প্রয়াশ। তেমনটি ঘটেছে 'চোখের বালি' উপন্যাসে আশালতার দাম্পত্য জীবনে। নিজের প্রেয়কে ছেড়ে আশা সকাল সকাল বিনোদিনীর কাছে যাওয়া প্রসঙ্গে প্রবাদ বাক্যটির ব্যবহার। ব্যবহারিক রূপটি এরূপ, — ''এ কী আশ্চর্য। চাকোরী যে আজ চাঁদকে ছাড়িয়ে মেঘের দরবারে।''[২১] এই কবিতার ভাব আশার পক্ষে বোঝা সহজতর হয়নি। তাই নিজেকে নির্বোধ হিসাবে তুলে ধরার জন্য লেখক আশার মুখে প্রবাদটির যথার্থ প্রয়োগ করেন। এখানে লেখক প্রবাদটির ভাব পুরোপুরি বজায় রেখেও 'উলুবনের' জায়গায় 'বেনাবন' করেছেন। গল্পের ধারানুসারে মূল প্রবাদটি বুঝে নিতে পাঠকের কোনও সমস্যা হয়নি। এই পরিবর্তনের মধ্যে ভাবকে ধরে রাখাই রবীন্দ্রনাথের সার্থকতা।

'বৃদ্ধস্য তরুনী ভার্যা' সংস্কৃত প্রবাদবাক্যটির অর্থ হল তরুণীর সংসর্গ বৃদ্ধ পুরুষের পক্ষে অনিষ্টকর। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে বৃদ্ধ বয়সে রসিক বাবুর জীবনে নব যৌবনের আগমন ঘটেছে। যা রসিকবাবুর পক্ষ ক্ষতিকারক। যৌবনাগুনে তার হৃদয় সূর্যের তাপের দ্বারা কাঠের মতো ফেটে যাচ্ছে। এই কথা শৈলবালার জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে রসিকের বৃদ্ধ যৌবন বিরহের ভাষ্যে উক্ত প্রবাদটি লেখক প্রযুক্ত করেন। প্রবাদটির ব্যবহারিক রূপটি হল, ---- ''যৌবনের দাহ বৃদ্ধকে পেলেই হু হু শব্দে জ্বলে ওঠে — সেই জন্যেই তো 'বৃদ্ধস্য তরণী ভার্যা' বিপত্তির কারণ।''[২২] এখানে রসিকে প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ

যৌবন বিরহ ভাবনার কল্পনার প্রকাশ পেয়েছে প্রবাদ বাক্যটি মধ্যে।

'ভিটেয় ঘুঘু চরা' প্রবাদ বাক্যটির অর্থ হল 'সর্বস্বান্ত হওয়া' 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের রুক্মিনী, যে সাধারণ নীচ প্রকৃতির স্ত্রীলোকের ন্যায় ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ঈর্ষাপরায়ণ, মনোরাজ্য অধিকার লোলুপ। সে মন্ত্রবলে ও ছলে এবং রাজপুত্র উদয়াদিত্যকে বশ করতে চায়। আবার অপর দিকে রাজা প্রতাপাদিত্য উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করেন। এই সংবাদ সীতারামের কাছে পৌঁছালে সে অনুমান করেন যে এর জন্য দায়ি ঐ রুক্মিনী। তাই সে রুক্মিনীর বাড়িতে গিয়ে তাকে শাসন করেন এবং লেখক কথিত ভাষায় বলেন, — ''সর্বনাশী, তোর ঘরে আগুণ জ্বালাইয়া দিব, তোর ভিটায় ঘুঘু চরাইব, আর যুবরাজকে খালাস করিব, তবে আমার নাম সীতারাম।''[২৩] সৎ উদয়াদিত্যকে ক্ষতি করার জন্য সীতারাম তাকে একেবারে সর্বস্বান্ত করে ছাড়বে। এছাড়া রুক্মিনীর অসৎ মনোভাব সকলের সম্মুখে প্রকাশ করবে সে। এ প্রসঙ্গে লেখক সীতারামের মুখে আরো একটি প্রবাদ স্থাপন করেন। প্রবাদটি হল 'মুখে চুনকালি মাখানো' কারণ তার জন্য যুবরাজের এই সমুহ বিপদ। সীতারামের মুখে পর পর দুটি প্রবাদ ব্যবহার করে লেখক চরিত্রের চারিত্রিক নীচতার প্রকাশ স্পষ্ট করে পাঠকের ও চরিত্রের একটি নতুন সেতু স্থাপন করেন। এতে প্রবাদ বাক্য দুটির প্রয়োগ সার্থক হয়েছে।

'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ' সংস্কৃত প্রবাদবাক্যটির অর্থ হল ভিন্ন জনের রুচি ভিন্ন রকমের। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে শ্রীশ শৈলবালাকে একসঙ্গে মিষ্টান্ন ভোজনের অনুরোধ জানায়, তাতে শৈল খাওয়ার চেয়ে সকলকে পরিবেশন করতে ভালোবাসে, এ-কথা বলা প্রসঙ্গে উক্ত প্রবাদটির ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ খেতে ভালোবাসে, আর কেউ না খেয়ে পরিবেশন করতে পছন্দ করে। এই বিচিত্র স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে লেখক প্রবাদের মধ্যে বাব প্রেরণ করেন।

'মধুরেণু সমাপয়েৎ' সংস্কৃত বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ সকল বিষয় মধুর

ভাবে পরিসমাপ্তি বাঞ্ছনীয়। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে পাত্র, শ্রীশ ও বিপিনকে জল খাবারের জন্য তাড়া দিল, তারা যে না খেয়ে নেই, সেই মনোভাব প্রকাশ করার প্রসঙ্গে লেখক রসিকের কথনভাষ্যে রসিক চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে উক্ত শব্দগুচ্ছের সার্থক প্রয়োগ হয়েছে তা গল্পের কনটেক্স বর্ণনাতে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। কারণ পাত্রদেরকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে-দাইয়ে বিদায় দিতে পারলে রসিক বাঁচওয়া।

'মগের মুলুক' বিশিষ্টার্থক শগুচ্ছটির অর্থ হল অনেক দূরস্তরের বিষয়। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে রজবপুরের আন্দোর ছেলে মধুসূদন আকালের সময় মগ নামক দেশ থেকে সস্তায় চাল আনে এবং তা বিক্রি করে সে পয়সাওয়ালা হয়েছে। এই দূরত্বের সস্তা দাম বোঝানো প্রসঙ্গে লেখক উক্ত শব্দগুচ্ছের ব্যবহার করেন। এখানে তিনি শব্দগুচ্ছের প্রয়োগে যথার্থ ভাবও বজায় রেখেছেন।

'মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া' বাগধারাটির অর্থ অকস্মাৎ মহা বিপদের উপস্থিতি' 'বউ ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসে সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে সীতারামের কাছে বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের কারারুদ্ধের খবর পাওয়া প্রসঙ্গক্রমে লেখক উক্ত বাগধারাটির প্রয়োগ করেছেন, কাহিনির বর্ণনানুসারে এটির ব্যবহার যথার্থ, কারণ উদয়াদিত্য ছিল বসন্তরায়ের একান্ত প্রাণের বস্তু। তার বিপদে তারও বিপদ। উদয়াদিত্যের কষ্ট মানে দাদামশায় বসন্ত রায়ের কষ্ট। উদ্ধৃতির মধ্যে ব্যবহৃত বাগধারাটি একই প্রসঙ্গানুসারে 'রাজর্ষি', 'চোখের বালি', 'প্রজাপতির নির্বন্ধ', 'নৌকাডুবি' উপন্যাসগুলোর ঘটনাক্রম বিন্যাসে হঠাৎ সমূহ বিপদার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

'মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার' প্রবাদটির অর্থ হল ছোটো কাজে সন্তুষ্ট না হয়ে, পৌরুষপূর্ণ কাজের প্রতিজ্ঞা করা। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে চিরকুমার সভার কার্যকারিতা ও প্রসারতা নিয়ে সভাপতি চন্দ্রমাধববাবু উদ্বিগ্ন

প্রকাশ করেন, এবং সভ্যদের কাছে তা সমাধানের পথ জানতে চাইলে, শ্রীশ সন্ন্যাস হয়ে দেশহিতব্রত পালনের কথা প্রসঙ্গে বিপিনের মুখে উক্ত প্রবাদের ব্যবহার। প্রবাদবাক্যের প্রয়োগ রূপটি হল, — ''বিপিন হাসিয়া কহিল, 'সে ঢের সময় আছে, যা কালই শুরু করা যেতে পারে এমন একটা কিছু কাজ বলো। 'মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার' যদি পণ করে বসো, তবে গণ্ডারও বাঁচবে ভাণ্ডারও বাঁচবে, তুমিও যেমন আরামে আছ তেমনি আরামে থাকবে।''[২৪] বিপিন সবকুল বর্তমান রেখে পৌরুষত্বের প্রমান দিতে চাই। লেখক কাহিনির দুই চরিত্রের মধ্যে ভাবসংজ্ঞাপকের জন্য প্রবন্ধটির যথার্থ ভাবে প্রয়োগ করেছেন।

'মাছের তেলে মাছ ভাজা' প্রবাদবাক্যটির অর্থ হল যৎসামান্য ব্যায়ে কার্যোদ্ধার করা। 'দুই বোন' উপন্যাসে উর্মির সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে নীরদ রিসার্চের কাজে বিদেশে যায়, এবং তার কাজের প্রয়োজনে রাজারাম রায় অর্থাৎ উর্মির বাবা তাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চায়লেও নীরদ তা নিতে রাজি ছিল না। কিন্তু নিজের গবেষণার সুবিধার্থে সে উর্মির সাথে বিবাহ বিছিন্ন করে এক ইউরোপীয় মহিলাকে বিয়ে করতে চায়। উর্মিকে বিয়ে করবে না, অথচ নিজের প্রয়োজনে সে রাজারাম বাবুর দেওয়া অর্থ নিতে চাই, তা উর্মিকে চিঠিতে জানানো প্রসঙ্গে উক্ত প্রবাদটি ঔপন্যাসিক নির্বাচন করে উর্মির কথনভাষ্যে যথার্থভাবে ব্যবহার করেন। নীরদের আচারণটা একেবারে উক্ত প্রবাদেরই মতো।

'মা ফলেষু কদাচন' ভাগবত গীতা থেকে গৃহীত সংস্কৃত প্রবাদটির মূল প্রবাদটি হল 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' এটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুদিত অর্থ হল 'কর্মে তোমার অধিকার, ফলে অধিকার নেই।' 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে ইন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী হয়েও য়ুরোপের মতো মহাদেশ ছেড়ে নিজের অসহায় মাতৃভূমিতে যোগ দিয়েছেন দেশ গড়ার কাজে। সেখানে

ইংল্যাণ্ডের মতো ল্যাবরেটরি নেই। নিজেকে ও অন্যান্যদেরকে নিয়ে দেশ উন্নত করার কাজের প্রসঙ্গে লেখক ঐ প্রবাদবাক্যটি ব্যবহার করেন। কারণ ইন্দ্রনাথ ইচ্ছা করলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারেন। কিন্তু নিজের দেশ অতলান্ধকারে পড়ে। তাই তিনি কোনও ফলের আশায় এই কর্মে পদার্পণ করেননি। তিনি দেশের সভ্য নাগরিক হিসাবে দেশের প্রতি দায়িত্ব পালন করছেন। ইন্দ্রনাথের ভাবনা ও তার দায়িত্ববোধের উপর নির্ভরশীল হয়ে লেখক প্রবাদটি যথার্থভাবে প্রয়োগ করেন।

'মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা' প্রবাদটির অর্থ হল 'চরম অপমান করে শাস্তি প্রদান করা।' 'বউ ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসে চন্দ্র দ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়ের মহিষী যশোহরের রাজকন্যা বিভাকে রাজার সম্মুখে রমাই ভাঁড় চরম অপমান করলে রামমোহন তা সহ্য করতে পারেনি। তার প্রতিশোধ নিতে রামমোহনের কথনকৌশলে লেখক উক্ত প্রবাদের ব্যবহার করেন। প্রয়োগ রূপটি এরকম, — ''তোমার মহিষীকে - আমার মা-ঠাকরুনকে ব্যাটা অপমান করিল — উহার হইয়াছে কী, আমি উহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া শহর হইতে বাহির করিয়া দিব, তবে আমার নাম রামমোহন।''[২৫] চরিত্রের চারিত্রিক বাককৌশলে প্রবাদটির ব্যবহার যথার্থ হয়েছে।

'মুখে ফুলচন্দন পড়া' প্রবাদবাক্যটির অর্থ হল সুসংবাদে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে ছেলের বিয়ে আর হবে না, এমনটি ভেবে নিয়ে মা ক্ষেমংকরী আপশোষ প্রকাশ করেন, কিন্তু শৈলজার পিতা চক্রবর্ত্তী মশায় জেদ ধরে প্রতীজ্ঞা করলেন, সে নলিনাক্ষকে ভালো পাত্রী দেখে বিয়ে দিয়ে ছাড়বেন। এই খুশির সংবাদ শোনা প্রসঙ্গে ক্ষেমংকরীর মুখে লেখক উক্ত প্রবাদের ব্যবহার করেছেন। কারণ তাঁর দ্বারা যে কাজ সম্ভব হয়নি, যদি তা চক্রবর্তীর দ্বারা পরিণতি পায় তাহলে তিনি খুব আনন্দিত হবেন। এই উদ্দেশ্যে প্রবাদটির প্রয়োগ সর্বতভাবে সার্থক।

‘মান্ধাতার আমল’ বাগধারাটি অতি প্রাচীনকাল বোঝাতে ব্যবহৃত। ‘বউঠাকুরাণীর হাট’ উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে উল্লেখিত চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়ের রাজকক্ষের দক্ষিণে থাকা রমাই ভাঁড়ের রসিকতার কথা, প্রসঙ্গে বাগধারাটির প্রয়োগ। রমাই ভাঁড়ের কথা রাজা থেকে দ্বারী পর্যন্ত সকলে অট্টহাসি হাসতে থাকেন। আর যে তার কথায় ঠোঁট খোলে না, তাকে রমাই ভাঁড় অতীত সময়ের ঠাট্টাগুলি শুনিয়ে তাদেরকে হাসাতে হাসাতে কাঁদিয়ে ফেলেন। তিনি এমনই রসিক যে সকলে হাসতে বাধ্য এবং তিনি অতীতের রসজ্ঞ কথাগুলি নিজের ভাণ্ডার থেকে টেনে বার করে বর্তমানে হাস্যরস সৃষ্টি করেন।

‘যস্মিন দেশে যদাচার’ সংস্কৃত প্রবাদটির মূলরূপটি হল ‘যস্মিন দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদী পার’ কিন্তু প্রবাদের প্রথমাংশটি পরিপূর্ণ প্রবাদ হিসাবে ব্যবহৃত। এটি অর্থ হল যেখানে যে নিয়ম সুপ্রতিষ্ঠিত, যেখানে সেই মেনে চলা। ‘প্রজাপতির নির্বন্ধ’ উপন্যাসে চিরকুমার সভার সভ্যদের পান, তামাক ও নারীসঙ্গ নিষিদ্ধ। কিন্তু অক্ষয়বাবু নিজের কাজে অভ্যাসের কথা সভ্যদের মাঝে বলা মাত্রই দুইটি জোগাড় হলেও তৃতীয়টি কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। একথা চন্দ্রবাবু বলার সাথে সাথে অক্ষয় নিজেকে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম তার প্রকাশ প্রসঙ্গে উক্ত প্রবাদের ব্যবহার। এক্ষেত্রে লেখকের প্রবাদ বাক্যটির প্রয়োগ সার্থক। আবার ‘গোরা’ উপন্যাসে একিই অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে প্রবাদ বাক্যটি।

‘যাদৃশী ভাবনা যস্যা সিদ্ধিভর্বতি তাদৃশী’ সংস্কৃত প্রবাদ বাক্যটির অর্থ হল ‘যে যেমন কামনা করে চিন্তা করে তার সেইরূপ ফললাভ হয়।’ ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে তেমনটি ঘটেনি। কন্যাদায় গ্রস্থ পিতা অনুকূলবাবু মেয়ে আশালতা উঁচু ঘরে বিবাহ দিতে চাইলেও, বরপক্ষে চাহিদা পুরণ করার মতো সম্বল তার নেই। এছাড়া নিজেরও মেয়েরা বড়ো হচ্ছে, তাদের বিবাহ দিতে

হবে। পিতৃহীন কন্যাকে তিনি ভালো ঘরে বিয়ে দিতে চাইলেও তার কোনও সম্বল নেই। এই প্রসঙ্গক্রমে না-বাচকার্থে লেখক প্রবাদটির প্রয়োগ করেছেন। গল্পে কনটেক্স অনুযায়ী এটির ব্যবহার সার্থক।

'যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন' সংখ্যাবাচক প্রবাদটির অর্থ হল দুটি বিষয়ে মধ্যে সামান্যতম পার্থক্য' 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে নীরবালার গানের খাতাটি নিয়ে যাওয়া বিপিনবাবুর অভদ্রতা নয়। সে নিজের ভুল নিজেই বুঝতে পেরে অনুশোচনা বোধে ভুগতে থাকে। খাতাটি নিয়ে যাওয়া যেমন অন্যায় ঠিক রক্ষণ করাটা তেমনি অন্যায়। এ কথা প্রসঙ্গে লেখক রসিকের কথনভাষ্যে উক্ত সংখ্যাবাচক প্রবাদটির যথার্থ ভাবে প্রয়োগ করেন। এটি পাঠক চরিত্র সম্মন্ধ নির্ভর প্রবাদ।

'যুদ্ধং দেহি' সংস্কৃত প্রবাদবাক্যটির অর্থ; হল প্রতিযোগিতার জন্য আহ্বান করা। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে বিপিন কলিযুগের ভীমসেন নামে আখ্যায়িত। তাই পালোয়ান বিপিনের সঙ্গে শ্রীশ বাহুযুদ্ধ করতে চাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীশের মুখে লেখক উক্ত প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন।

'রথ দেখা কলা বেচা' এটি অতি চিরপরিচিত প্রবাদবাক্য। যার অর্থ হল এক কাজের উদ্দেশ্যে গিয়ে অন্য কাজও করা। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে লেখক অন্যান্য প্রবাদ বাক্যের মতো এখানে সরাসরি প্রবাদ ব্যবহার করেননি। তিনি বাক্যের ভাব কৌশলে প্রবাদটি উপস্থাপন করেছেন। উপস্থাপিত রূপটি হল, — ''যা হোক, শেষে এই স্থির হয়েছে, তিনি কাশীতে তাঁর বোনপোর কাছে যাবেন, যেখানে পাত্রেরও সন্ধান পেয়েছেন, তীর্থ দর্শনও হবে।''[২৬] তিনি এক যাত্রায় দুই কাজ করবেন। এই প্রসঙ্গানুসারে প্রবাদটির সরাসরি ইঙ্গিত যথার্থ ও সার্থক হয়েছে।

'রামরাজত্ব' 'বউঠাকুরানী হাট' উপন্যাসে 'রামরাজত্ব' বিশিষ্টার্থক শব্দটির লেখক ব্যবহার এটির অর্থ 'ন্যায় পরায়ণ ধার্মিক রাজার সুশাসনে সুখময়

দ্বিশালী রাজ্য'। উপন্যাসে এটির প্রয়োগ রূপটি হল, — ''সীতারাম কহিল, 'আহা যুবরাজ যখন রাজা হইবে, তখন যশোরে রামরাজত্ব হইবে, ততদিন যেন আমরা বাঁচিয়া থাকি।''[২৭] রাজা প্রতাপাদিত্যের যেমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, ঠিক তেমনি তার কড়া শাসন ব্যবস্থা। তাঁর রায় রাজ্যের শেষ কথা। তাই রাজকার্যে নিযুক্ত সকল কর্মী তাঁর ভয়ে তটস্থ, কিন্তু তাঁর পুত্র হয়েও উদয়াদিত্যের মধ্যে পিতৃত্ব আচারের প্রকাশ মাত্র নেই। সে সৎ, ধার্মিক ও পরোপকারী, তার আচারণে রাজকর্মচারীরা সকলেই সুখী, তাই উদয়াদিত্যের রাজত্বকালেই আরামে দিনযাপন করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্টার্থক শব্দটির ব্যবহার এখানে সার্থক হয়েছে।

'রাজায় রাজায় বাধে রণ, উলুখড়ে হয় মরণ' প্রবাদবাক্যটির অর্থ হল নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে অপরের ক্ষতি করা। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের আত্মকথা পরিচ্ছেদে জমিদারের অধিগ্রহণ করতে যাওয়া পঞ্চুর যৌরসি স্বত্বাধিকারী কয়েক বিঘা জমি কিনে মাষ্টার মশায় পঞ্চুকে দেবেন, আর যেখানেই-পঞ্চু তার কাপড়ের ব্যবসা নির্ভয়ে চালিয়ে যাবে। এই কথা শোনার পর লেখক পঞ্চুর কণ্ঠে উক্ত প্রবাদটি ব্যবহার করেন। কারণ দুই ক্ষমতা শালী ব্যক্তির মধ্যে মনদ্বন্দ্ব শুরু হলে, যেখানে উচ্চপদস্থ লোকের সমাগম ঘটবে, আর প্রকৃত ক্ষতি হবে পঞ্চুর। গল্পের কাহিনি বিন্যাসের ধারায় গল্পকার যথার্থ জায়গায় এবং প্রকৃত চরিত্রের মুখে প্রবাদটি প্রয়োগ করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ গল্পে প্রবাদের প্রথমাংশ ব্যবহার করে সম্পূর্ণ প্রবাদের ভাবকে ব্যক্ত করেন।

'ললাট-লিখন না যায় খণ্ডন' প্রবাদবাক্যটির অর্থ হল কপালে বিধাতার লেখা কোনও পরিবর্তন করা যায় না। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে কমলা জন্মের পূর্বে বাবাকে, জন্মের ছয়মাস পর মাকে এবং বিয়ের পরের দিন মহাপ্রলয়ে রমেশের বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়সজনকে হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব। কমলার জীবনের দুঃখ জনক ঘটনা প্রসঙ্গে লেখক রমেশের কল্পভাবনায় ভারতচন্দ্রের

বিখ্যাত প্রবাদের প্রয়োগ দেখা যায়। যদিও গল্পকথক প্রবাদটি হুবহু ব্যবহার করেননি। কারণ কমলার মুখাবয়বে দুর্ঘটনার কোনও ছাপ না থাকলেও, গল্প কাহিনির ভাবনায় উক্ত ভাবটি ধরা পড়ে। পৃথিবীতে তার আগমনে একের পর এক অঘটন, যেন বিধাতা তার ভাগ্যে লিখে পাঠিয়েছেন। এটি একটি লেখক পাঠক সম্পর্কীয় প্রবাদ।

'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' সংস্কৃত প্রবাদবাক্যটির অর্থ হল সুস্পষ্ট করে বলা। 'গোরা' উপন্যাসে মহিমের অফিসে কর্মচারীদের প্রতি বড় সাহেবের অভদ্রতা খবরের কাগজে ফলাও করে বের হওয়ায় সাহেব মহিমকে সন্দেহ করে। এর প্রতিবাদ সরূপ মহিম সাহেবকে চিঠি দিতে চায়। সেই চিঠির বয়ানে কোনও সত্য কথা থাকে না, তার প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ মহিমের কথনভাষ্যে উক্ত প্রবাদটি প্রযুক্ত করেন। কারণ অফিসে কোনও কিছুই সত্য দ্বারা যাচাই করা হয় না। মিথ্যা বলাই তাদের মূল কর্তব্য। তাই মহিম হুবহু মিথ্যা দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে সাহেবকে চিঠিতে জানাতে চায়, যাতে মহিমের দোষ স্খালন হয়। লেখক ঠিক প্রসঙ্গে প্রবাদটি প্রয়োগ করেছেন।

'শনির দৃষ্টি' বিশিষ্টার্থক শব্দটির অর্থ হল কু-দৃষ্টি বা খারাপ দৃষ্টি। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে মধুসূদনের সময় খারাপ যাওয়ায় সে তা জানতে গনৎকার বেঙ্কটস্বামীর কাছে যায়। সমস্ত বিষয় জানার পর গনৎকার মধুসূদনের রাশিচক্রের ছকে ধন ঐশ্বর্য্যের প্রতি মন্দ সময়ের ইঙ্গিত পাওয়া প্রসঙ্গে লেখক উক্ত শব্দটি যথার্থ ভাবে নির্বাচন করে ব্যবহারের সার্থক করেছেন।

'শুভস্য শীঘ্রং' প্রবাদাঙ্গটির অর্থ হল শুভ কর্ম তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা ভালো। মূল প্রবাদের রূপটি এই রকম 'শুভস্য শীগ্রং অশুভস্য কালহরণম' তবে সর্বক্ষেত্রে প্রবাদাঙ্গটি ব্যবহারে মূল প্রবাদের ভাবটি প্রযোজ্য। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসে মৃত্যুঞ্জয় ও শ্রীদারুকেশর মুখোপাধ্যায় বিয়ের জন্য পাত্রী দেখতে আসলেও, পাত্রী দেখার চেয়ে পাত্রী ভগ্নিপতি অক্ষয়ের সাথে ঠাট্টা -

ইয়ার্কি এবং অনান্য প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে প্রবাদাঙ্গের উপস্থাপনা প্রসঙ্গানুসারে লেখক সুনির্বাচিত ভাবে প্রবাদাঙ্গটির প্রয়োগ করেন। এটি লেখক ও পাঠকের সম্মন্ধ নির্ভর।

'ষোল আনা' বিশিষ্টার্থক শব্দটির অর্থ হল পরিপূর্ণ ভাবে কোনও কিছু করা। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে লেখক ইন্দ্রনাথের কথনভাষ্যে য়ুরোপের উঁচু জাত ইংরেজদের স্বভাব চরিত্রের গুণ বিচারের প্রসঙ্গে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। আবার 'গোরা' উপন্যাসে লেখক একই অর্থে শব্দটি বার বার কাহিনির গতিতে সুকৌশলে ব্যবহার করেন।

'সাত রাজার ধন মানিক' বিশিষ্টার্থক শব্দ গুচ্ছটির অর্থ অতি আদরের বস্তু। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে বিবাহের বয়স অতিক্রান্ত হলেও কমলার যে বর জুটেছে তা নিয়ে তার সঙ্গীরা খ্যাপাতে থাকে এ প্রসঙ্গে না-বাচকার্থে লেখক কমলার ভাষ্যে উক্ত শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ করেন। প্রয়োগরূপটি হল এরূপ, — ''অধিক বয়সে বরকে পাইয়া আমি যে সাত রাজার ধন মানিক' পাই নাই, ইহার দেখাইবার জন্য আমি তাঁহার দিকে দৃকপাত মাত্র করি নাই।''[২৮] এখানে লেখক খুব সুকৌশলে না ভাবটি গল্প বর্ণনার ছলে অবজ্ঞার সুর পাঠককে বুঝিয়েছেন।

আবার একিই অর্থে 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুদিনী দাদাদের দেনার দায় এবং নিজের আইবুড়ো দশা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায়, তার প্রাণ প্রিয় মানুষকে সাত রাজার ধন মানিক বলে আখ্যা দেওয়া প্রসঙ্গে উক্ত শব্দগুচ্ছের ব্যবহার হয়েছে। শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ রূপটি হল, — ''এক-একদিন রাতে বিছানা থেকে উঠে বাগানের মর্মরিত ঝাউগাছ গুলোর মাথার উপরে চেয়ে থাকে, মনে-মনে বলে, 'কোথায় আমাকে রাজপুত্র, কোথায় তোমার সাত রাজার ধন মানিক, বাঁচাও আমার ভাইদের, আমি চিরদিন তোমার দাসী হয়ে থাকব।''[২৯]

‘সাপের পাঁচ পা দেখা’ প্রবাদটির অর্থ ‘অত্যন্ত গর্বিত ও উৎশৃঙ্খল হওয়া’, ‘বউঠাকুরানীর হাট’ উপন্যাসে গৃহদাহে কিভাবে যুবরাজের মৃত্যু হয়েছে, তা রাজ সভাভবনে প্রহরীরা নিজেদেরকে বাঁচানোর অছিলায় ঘটনাটি বর্ণনা করতে থাকেন। তাদের পাহারায় কোনও ঘাটতি ছিল না তা তারা রাজাকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে চাই। এমন সময় প্রত্যক্ষদর্শী রুক্মিনী সেখানে উপস্থিত হয়, এবং সে প্রহরীদের প্রকৃত ঘটনাটি রাজার কাছে বলেন। বসন্ত রায়ের সঙ্গে উদয়াদিত্যে পালিয়ে যাওয়ার সময় সে প্রহরীদেরকে আটকানোর কথা বলে ও তারা কোন কর্ণপাত করে নি। কারণ তারা রাজার বাড়িতে চাকরি করে, তারা রাজাদেশ ছাড়া কোনও কিছু করতে পারবেনা, তাদের অহংকার হয়েছে। এই প্রসঙ্গক্রমে লেখক রুক্মিনীর মুখে প্রবাদ বাক্যটির প্রয়োগ করেন। ব্যবহারিক প্রয়োগটি এরূপ — ‘‘কাল যখন তোদের হাতে পায়ে ধরিয়া, পই পই করিয়া বলিলাম, ওগো তোমাদের যুবরাজ তোমাদের রায়গড়ের বুড়া রাজার সঙ্গে পালায়, তখন যে তোরা পোড়ার মুখোরা আমার কথায় কান দিলি নে? রাজার বাড়ি চাকরি কর, তোমাদের বড়ো অহংকার হইয়াছে, তোমরা সাপের পাঁচ-পা দেখিয়াছ! পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরিবার তরে!’’[২০] অর্থাৎ তাদের কর্মের দিকে কোনও খেয়াল নেই, তারা রাজসুখে দিন যাপন করছে। এখানে লেখক প্রহরীদের পরিস্থিতি ও তৎঅবস্থার ভাব বোঝাতে পর পর দুটি বিখ্যাত প্রবাদ উল্লেখ করেছেন।

‘সোনার চাঁদ’ শব্দগুচ্ছটির অর্থ হল রূপে গুণে সুন্দর পুরুষ বা নারী। ‘প্রজাপতির নির্বন্ধ’ উপন্যাসে পুরবালার মায়ের মুখে লেখক শব্দগুচ্ছটির উপস্থাপন করেন। কারণ মায়েদের মুখে এটির ব্যবহার মানান সই ও সর্বদা সুশোভনীয়। তাই শ্রীশ এবং বিপিনের বয়স যাই হোক না কেন, নিজের বয়স প্রাপ্ত কন্যাদের জন্য এই যথেষ্ট। তাই তাদের প্রতি মা জগত্তারিণীর মুখে সন্তান বাৎসল্য শব্দগুচ্ছটির প্রয়োগ সার্থক। এটি একটি পাঠক চরিত্র সম্মন্ধ নির্ভর।

‘স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ’ সংস্কৃত প্রবাদটির অর্থ হল নিজের পরিচয়ের কৃতিত্বে প্রসিদ্ধিলাভ করা। ‘প্রজাপতির নির্বন্ধ’ উপন্যাসে শৈলবালা পুরুষ নাম (শ্রী অবলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়) ধারণ করে চিরকুমার সভায় উপস্থিত হয়। সেখানে রসিক শৈলবালাকে ছদ্যনামে সভা সম্মখ্যে পরিচয় করান, এবং বলেন অবলাকান্ত নামে পৌরুষার্জন করাটা তার কোনও মমত্ব নেই। তার অবলাকান্ত নামটি পরিবর্তন করা প্রসঙ্গে উক্ত প্রবাদটি উদ্ধৃতি চিহ্নসহ রসিকে মুখে লেখক ব্যবহার করেন। কথক ভাবকে অপরিবর্তীত রেখে প্রবাদটি উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করেন। প্রবাদ বাক্যটির প্রয়োগ রূপটি হল, —— ‘‘নামটির প্রতি আমারও বিশেষ মমত্ব নেই — যদি পরিবর্তন করে বিক্রম সিংহ বা ভীমসেন বা অন্য কোনো উপযুক্ত নাম রাখেন তাতে উনি আপত্তি করবেন না। যদিও শাস্ত্রে আছে বটে ‘স্বনামা পুরুষো ধন্যত্ব’ — কিন্তু উনি অবলাকান্ত নামটির দ্বারাই জগতে পৌরুষ অর্জন করতে ব্যাকুল নন।’’[৩১] এখানে ব্যবহৃত প্রবাদটি চরিত্রভাব সংজ্ঞাপক। উক্ত প্রবাদটি ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসে নিখিলেশের আত্ম কথন বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক নিখিলেশের ভাষ্যে ব্যবহার করেন।

‘স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরিধর্মে ভয়াবহঃ’ সংস্কৃত প্রবাদবাক্যটির অর্থ হল নিজের প্রকৃতি ও বিবেকানুসারে কাজ করা কর্তব্য তার বিপরীত কিছু করলে ক্ষতির সম্ভবনা। ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে গুরুজী নিজ সৃষ্ট ধর্মমতাদর্শের পথে সকলকেই চালোনা করতে চাই। প্রতিষ্টা করতে চায় নিজস্ব প্রভাব। তাই গৌন হয়ে ওঠে তার মতাদর্শে বিশ্বাসী শিষ্যদের আদি ভাবনা। নিজ ভাবনা-চিন্তা বিসর্জন দিয়ে অপরে আদর্শে পথ চলা প্রসঙ্গে গল্পকার শচীশে গভীর ভাবনায় বিরক্তি প্রকাশে উক্ত প্রবাদটি নির্বাচন করেছেন। এটি একটি চরিত্র পাঠক সম্মন্ধীয় প্রবাদবাক্য।

‘স্ত্রী হৃদয়ের রহস্য বিধাতা বোঝেন না’ ‘প্রজাপতির নির্বন্ধ’ উপন্যাসে নীরবালার গানের খাতায় লেখা ‘তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়’ গানের ভাবার্থ লিখে রাখার কারণ জানার প্রসঙ্গে বিপিন রসিককে জিজ্ঞাসা করলে, তার প্রত্যুত্তরে নারী তথা স্ত্রী জাতির রহস্যময় হৃদয়ের কথা বোঝাতে রসিক উক্ত মূল প্রবাদটির ভাবার্থ ব্যবহার করেন। প্রবাদের প্রয়োগরূপটি অনুদিত। প্রয়োগরূপটি এরূপ, — “স্ত্রী হৃদয়ের রহস্য বিধাতা বোঝেন না এই রকম একটা প্রবাদ আছে, রসিক বাবু তো তুচ্ছ।”[৩২] এখানে লেখক স্ত্রী হৃদয়ের রহস্যের গভীরতাকে বুঝিয়েছেন। এটি লেখক-পাঠক সম্মন্ধ নির্ভর একটি প্রবাদ।

‘স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরষস্য ভাগ্যং, দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ’ সংস্কৃত প্রবাদ বাক্যটির অর্থ হল নারী চরিত্র এবং পুরুষের ভাগ্য সকলের অজ্ঞাত থাকা। ‘করুণা’ উপন্যাসে নিধিকে সঙ্গে করে পণ্ডিতমশায় প্রয়াগে যাওয়ার সময় রেলস্টেশনে করুণার সাথে দেখা হয়। পণ্ডিতমশায় করুণার অসহায়তা লক্ষ করে, তাকে প্রয়াগে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। এমতাবস্থায় স্টেশনে স্বরূপের দেখা যায়, এবং করুণার আচার-ব্যবহারে পরিবর্তন দেখে নিধি পণ্ডিতমশায়কে জানানো প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ পণ্ডিতের ভাবনায় বিখ্যাত প্রবাদটি কোনও রকম পরিবর্তন না করে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে ব্যবহার করেছেন। এখানে মূলত প্রবাদটি করুণার স্বভাব চরিত্রের দিকটি নির্দেশ করতে গিয়ে কথক ভাবনায় প্রবাদটির সার্থক প্রয়োগ হয়েছে।

‘হাড় জ্বালানো’ বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ হল, অতিরিক্ত বিরক্ত করা। ‘নৌকাডুবি’ উপন্যাসে কমলা নিজের স্বামীর পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও সে পরিচয় করতে পারেনি। সে নলিনাক্ষের চিন্তায় নবীনকালীর বাড়ির কাজকর্মে একের পর এক ভুল করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে লেখক নবীনকালীন মুখে উক্ত শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ করেছেন।

‘হাড় জ্বালানো’ বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ হল পরিপূর্ণভাবে হিংসায় আক্রান্ত হওয়া। ‘ঘরে-বাইরে’ উপন্যাসে বিমলার দুই জা কথায় কথায় ও চলতে-ফিরতে বিমলা ও তার স্বামীকে নিন্দাবাদ করেন, তবু তার স্বামী বিধবা দুই বউদিদের উপর সংসারের সমস্ত দায়িত্বভার ছেড়ে তিনি কলকাতায় বাস করতে চায়। স্বামীর এই সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গানুসারে গল্পকথন বিমলার চোখে মুখে রাগের রূপ দেখাতে শব্দগুচ্ছটি নির্বাচন সার্থক হয়েছে।

‘হাড় কালি হওয়া’ বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ হল প্রচণ্ড কষ্ট করা। ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসে মধুসূদনের টাকা পয়সার অভাব নেই, কিন্তু সে বিয়ে করে মাকে আরাম না দিয়ে, বরং বুড়ি মাকে দিয়ে সংসারিক সমস্ত কাজ করিয়ে তাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে, তার টাকা থেকেও লাভ কি, এ প্রসঙ্গে লেখক তিনকড়ির কথনকৌশলে মায়ের কষ্ট বোঝাতে উক্ত শব্দগুচ্ছের সঠিক প্রয়োগ হয়েছে এখানে।

‘হাড়ে হাড়ে’ বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ হল গভীরোতর ভাবে কিছু ঘটা। ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসে পূর্ব পুরুষ ধরে ঘোষাল এবং চ্যাটার্জী পরিবারের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের গভীরতা বোঝাতে লেখক উক্ত শব্দগুচ্ছটি যথাযথ নির্বাচন করে প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ দুই পরিবারের দ্বন্দ্বের গভীরতাকে তুলে ধরেন শব্দগুচ্ছের মধ্যে।

‘হালে পানি পায় না’ প্রবাদটির অর্থ হল শত চেষ্টাতে সমর্থন না পাওয়া। ‘যোগাযোগ’ শ্যামাসুন্দরী ভাবতে শুরু করেন যে মধুসূদনের সংসারে তার স্থান মোটামুটি পাকা। এই প্রত্যাশায় সে মধুসূদনের প্রাণ প্রিয় বাড়ির কর্মচারীদের উপরের কতৃত্ব ফলায়। বাড়ির প্রাচীন চাকর দধির কাজকর্মে শ্যামার ভালো না লাগায় সে তিরস্কার করে। অপর দিকে দধির প্রতি শ্যামার ঔ তিরস্কার মধুসূদনের কাছে পুরস্কৃত হয়। এতে শ্যামার অভিমান জন্মায়। মধুসূদনের প্রতি তার অভিমান কোনও কাজ না হওয়ার প্রসঙ্গে লেখক

প্রবাদটি নির্বাচন করে, যথোপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করেন।

'হাল ছেড়ে দেওয়া' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ কোনও কিছুর প্রতি আশা ত্যাগ করা। 'যোগাযোগ' উপনাসে মধুসূদনের মা বউমা ও নাতিনাতনিদের মুখ দেখার কথা মধুসূদনকে জানায়, এতে মধুসূদন বলে তার বিয়ে করার ফুরসত নেই। কারণ তার কারবার উন্নতির জোয়ার বেয়ে মফস্বল থেকে কলকাতায় পৌঁছেছে। ব্যবসায়ীক কাজকর্মে ছেলের ব্যস্ততা দেখে মা নাতিনাতনির আশা ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন। ছেলের বিয়ে দেওয়া এবং নাতি নাতনিদের মুখ দেখা প্রসঙ্গে লেখক উক্ত শব্দগুচ্ছের ব্যবহার করেন।

'হাল ছেড়ে দেওয়া' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ হল ফল না পেয়ে হতাশ হয়ে চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া। 'দুইবোন' উপন্যাসে কর্মব্যাস্ত শশাঙ্ক শরীরে প্রতি সর্বদা উদাসীন, শর্মিলা শত চেষ্টা করেও তাকে বদলাতে পারেনি। তবে বোন শর্মি বলার সাথে সাথে শশাঙ্ক নিজের পূর্বের অবস্থাতে মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তন করে ফেলে। কিন্তু শর্মিলা বার বার শশাঙ্ককে বলে ও কোনও ফল পায়নি। এই ফল না পাওয়ায় হতাশ হওয়া প্রসঙ্গে লেখক উক্ত শব্দগুচ্ছটির ব্যবহার করেন। তবে কাহিনির গতি এবং ভাষার অবয়বে এটির প্রয়োগ সার্থক হয়েছে।

'হাড়ে হাড়ে জ্বালানো' বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছটির অর্থ হল প্রচণ্ড ভাবে বিরক্ত করা। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে এলার মা চায় এলাকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত না করে সংসারের প্রয়োজনীয় কাজকর্মের শিক্ষা দিতে। যাতে এলা শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে সংসারের কাজে অসুবিধা না হয়। কিন্তু তার বাবা নরেশ উক্ত আদর্শে মেয়েকে মানুষ করার ভাবনায় মেয়েকে শহরে পাঠান। এ প্রসঙ্গে মা মায়াময়ী কণ্ঠে বিদ্রুপ ভঙ্গিতে লেখক শব্দগুচ্ছটি প্রয়োগ করে শ্বশুরবাড়িতে এলার ভবিষ্যৎ অবস্থানকে নির্দেশ করেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল কুমার, 'উপন্যাস শিল্পী রবীন্দ্রনাথ', রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৮

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'চোখের বালি', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা - সূচনাংশ

৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্ররচনাবলী নবম খণ্ড উপন্যাস', পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৪৭৩

৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৮৪

৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্ররচনাবলী অষ্টম খণ্ড উপন্যাস', পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৪১

৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্ররচনাবলী নবম খণ্ড উপন্যাস', পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৬৬৭

৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭১৪

৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪০৭

৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৫৯

১০। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭২৭

১১। তদেব, পৃষ্ঠা - ৮৯৪

১২। সেনগুপ্ত, অধ্যাপক শ্যামল, মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ (সম্পাদিত), 'রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি', বামা পুস্তাকালয়, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৬৭

১৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্ররচনাবলী অষ্টম খণ্ড উপন্যাস', পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৬০০

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ১১৬

১৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্ররচনাবলী নবম খণ্ড উপন্যাস', পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৪২৮

১৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্ররচনাবলী অষ্টম খণ্ড উপন্যাস', পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৮৩
১৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ২০২
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ২২৫
১৯। সেনগুপ্ত, অধ্যাপক শ্যামল, মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ (সম্পাদিত), 'রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি', বামা পুস্তাকালয়, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৪৩
২০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্ররচনাবলী অষ্টম খণ্ড উপন্যাস', পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ১১
২১। সেনগুপ্ত, অধ্যাপক শ্যামল, মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ (সম্পাদিত), 'রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি', বামা পুস্তাকালয়, কলকাতা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ২৫
২২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্ররচনাবলী অষ্টম খণ্ড উপন্যাস', পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৩৪২
২৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৪৬
২৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৯২
২৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৭৪
২৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৮৭
২৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩৬
২৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭০৫
২৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্ররচনাবলী নবম খণ্ড উপন্যাস', পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৫৪৮
৩০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্ররচনাবলী অষ্টম খণ্ড উপন্যাস', পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ১৫৯
৩১। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩১৫
৩২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৫২